বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

দ্বিতীয় বর্ষ■সংখ্যা - ৩■সেপ্টেম্বর ২০১২

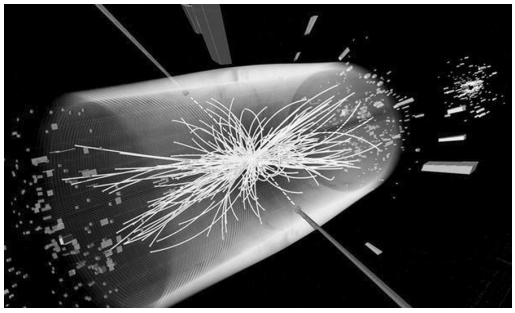

সম্পাদকীয় ১

হিগস বোসন কণা ও তারপর ...

সম্পাদকীয় ২

দিকে দিকে আওয়াজ উঠুক স্বাস্থ্য সামাজিক অধিকার!

★জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিসের স্বরূপ ও প্রতিকার

★ট্রান্সিট অফ ভেনাস

★পূর্ব বড়িষা অঞ্চলে জন্ডিস সংক্রমণ ঃ একটি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট

★চার্লি দ্য কিড ঃ একটি মানবতার দৃষ্টান্ত★

সাক্ষাৎকার■পাঠকের কলম■কবিতা

■রিপোর্ট■বিজ্ঞানের খবর■সংগঠন সংবাদ

দ্বিতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ৩❖সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদকীয় ১

হিগস বোসন কণা ও তারপর ...

অবশেষে সন্ধান মিলল বহু আকাঙ্খিত হিগস্-বোসন কণার। বহুদিন পূর্বেই এমন কণার অস্তিত্বের গাণিতিক প্রমাণ ছিল বিজ্ঞানীদের হাতে, গত ৪ঠা জুলাই ২০১২ সার্ন (কনসিল অয়রোপিন পুর লা রেশের্শে নিউক্লিয়্যার)-এর অর্থাৎ পরমাণু গবেষণা বিষয়ক ইউরোপীয় সংগঠনের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল থেকে একটি ৫ সিগমা স্তরের এবং মোটামুটি ১২৬ জি ই ভি ভরের নতুন কণার পরিস্কার সংকেত পাওয়া গেছে। নিশ্চিতভাবে এটি একটি বোসন কণা এবং আদ্যাবধি পাওয়া সবচেয়ে ভারী কণা। এই গবেষণা ও তার থেকে পাওয়া পর্যবেক্ষণ প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তরে উন্নীত করবে এবং ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার জন্য দ্বার খুলে দিয়েছে যা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বহু অজানা রহস্যের বিশেষ করে তার সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বহু রহস্যের হদিশ পেতে সাহায্য করবে। সারা বিশ্বের একশ দেশের প্রায় দশ হাজার বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে জেনিভায় নির্মিত হয় **লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (এল এইচ সি)** যন্ত্র যা প্রকৃত অর্থেই বিশ্বের বৃহত্তম যন্ত্র। মাটির ১৭৫ মিটার গভীরে ২৭ কিমি পরিধি বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গে প্রায় আলোকের গতি সম্পন্ন প্রোটন কণার সংঘর্ষ ঘটাতে সক্ষম এল এইচ সি যন্ত্রটি নির্মাণে খরচ হয় প্রায় আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত তত্ত্ব প্রচলিত আছে তার মধ্যে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হল মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব যা বিগ ব্যাং থিওরি নামে খ্যাত। এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সব রকমের উপাদান বৈজ্ঞানিকদের হাতে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল এমন কণার যা পদার্থকে ভরপ্রদান করে। মহাবিস্ফোরণকালে এমন কণার অস্তিত্ব গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তাই বিজ্ঞানী পল জিরাক এই কণার নাম দিয়েছিলেন বোসন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী পিটার হিগস এই তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেন এবং একটি বিশেষ ধরনের বোসন কণার অস্তিত্বকে দৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যাকে হিগস বোসন কণা বা সংক্ষেপে হিগস কণা হিসাবে অভিহিত করা হয়। হিগস কণা ব্যতীত অন্যান্য বোসন কণার অস্তিত্বও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। সদ্য গবেষণায় যে কণার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তা হিগস কণার প্রায় অনুরূপ। প্রশ্ন হল এই কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এতবড় আয়োজনের কি প্রয়োজন? আসলে স্বাভাবিক অবস্থায় এমন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না তাই মহাবিস্ফোরণকালের অনুরূপ পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই এই মহা আয়োজন। যদিও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা এই কণার চরিত্র সম্বন্ধে একশ ভাগ নিশ্চিত নন। ১০০% নিশ্চিত হতে গেলে আরও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। প্রয়োজন আরও সুবিশাল ও অতিক্ষমতাশালী যন্ত্রের। তাহলে বোঝা যাবে ঐ কণার চরিত্র। আর তা জানতে পারলেই এই মহাবিশ্বের এমনকি প্রাণ সৃষ্টির রহস্যও উদ্ঘাটিত হবে এমনকি জানা যাবে এই মহাবিশ্বের ৯৬% পদার্থ বা শক্তির হারিয়ে যাবার রহস্য।

কিন্তু একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশ হচ্ছে, বিজ্ঞান আরও দৃঢ় বস্তুগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঐশ্বরীয় তথা ভাববাদী তত্ত্বগুলির ভিত্তি দুর্বল হতে দুর্বলতর হচ্ছে। বাজারী পত্রিকাগুলি এই কণাকে **'ঈশ্বর কণা'** নামে প্রচারিত করায় বিজ্ঞানীরা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। হিগস্ কণার নামকরণ যে বিজ্ঞানীর নামানুসারে হয়েছে সেই বিজ্ঞানী পিটার হিগস্ বলেছেন **'ঐ কণাকে ঈশ্বর কণা নামে অভিহিত করার কোনও কারণ নেই কারণ এই কণা হল সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনকারী কণা যা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে।'**

প্রকৃতিকে জানার ও জয় করার পথে মানুষের অভিযান শুরু তার চেতনার বিকাশের আদিম লগ্ন থেকেই। এই দীর্ঘ অভিযানে সে অতিক্রম করেছে একের পর এক মাইলফলক। পদার্থকে জানার লক্ষ্যে ১৮০৮ সালে ইংরেজ পদার্থ ও রসায়নবিদ জন ডালটন প্রথম আধুনিক পারমানবিক তত্ত্ব'র সূচনা করেন। তিনি বলেন পদার্থ পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং তা অবিভাজ্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জে. জে. থমসন

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন পরমাণু ভঙ্গুর – আবিষ্কার হল অপরাতড়িৎ ধর্মী কণা ইলেক্ট্রন। এরপর একে একে আবিষ্কৃত হয় পরাতড়িৎধর্মী প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন। বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন জাগে পরমাণুর মধ্যে আদি কণাগুলি অর্থাৎ ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থান কেমন? পরমাণু স্থায়ী হচ্ছে কিভাবে? ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড তার বিখ্যাত স্বর্ণফলক পরীক্ষার মাধ্যমে পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অংশকে চিহ্নিত করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী নীলস বোর হাইড্রোজেন বর্ণালীর ও হাইড্রোজেন পরমাণুর স্থায়িত্বের সুনির্দিষ্ট গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডি ব্রগলী বলেন ইলেক্ট্রন হল কণা ও তরঙ্গ এই দ্বৈত চরিত্রের। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিকশিত হয় **কোয়ান্টাম মেকানিকস্ তত্ত্ব**। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা নীতি' পরমাণুকে আরও পরিষ্কারভাবে জানতে সাহায্য করে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় অ্যাক্সিলারেটর অর্থাৎ বিভিন্ন কণাকে গতিশীল করার যন্ত্র যা পরমাণুর মধ্যে অন্যান্য কণিকার আবিষ্কারে সাহায্য করে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিকশিত হয় মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রামাণিক মডেল। পার্টিকল ফিজিক্স-এর অভুতপূর্ব প্রামাণিক ও গাণিতিক বিকাশ সাধন বিজ্ঞানী মহলকে উজ্জীবিত করে – ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সার্ন গঠিত হয়।

সার্ন-এর এই সুবিশাল কর্মকান্ডে শরীক হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়েকশ সুদক্ষ বিজ্ঞানী। এদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগার যেমন কোলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, এলাহাবাদের হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ভুবনেশ্বরের ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স থেকে নির্বাচিত বহু বিজ্ঞানী এতে ছিলেন।

প্রকৃতিকে জানার ও সমাজকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান এইভাবেই তার ভূমিকা রেখে চলেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কোন ব্যক্তির নয় বরং তা সমাজের প্রতিটি মানুষের। এই জ্ঞান মানেনা কোন দেশীয় গন্ডি, মানেনা কোন মহাদেশীয় গন্ডি। সার্ন-এর ডিরেক্টর জেনারেল রলফ্ ডিটার হয়্যার বলেছেন সার্ন-এর ই (অর্থাৎ ইউরোপীয়ান) অক্ষরটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রতিটি কৌতুহলী বিজ্ঞান প্রেমী মানুষ তাকিয়ে থাকবে ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কারণ তখনই শুরু হবে এবিষয়ে আরও গভীর গবেষণা, জ্ঞানের নবদিগন্তের আশায়।■

সম্পাদকীয় ২
দিকে দিকে আওয়াজ উঠুক স্বাস্থ্য সামাজিক অধিকার!

একটা সময় ছিল যখন মানুষ প্রকৃতির কাছে ছিল নেহাতই অসহায়। বিভিন্ন রোগের কারণ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল অপ্রতুল। কিছু সাধারণ আচার আচরণ পালন এবং টোটকা সেবন করাই ছিল একমাত্র চিকিৎসা। বিভিন্ন রোগকে মোকাবিলা করার অক্ষমতার জন্য সে অসহায়ভাবে নিজেকে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করত। তার চেতনায় এসবের পিছনে ছিল দেবতা বা অপদেবতার হাত। মড়ক, মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়াটা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। মানুষ মনে করত ভগবান রুষ্ট হয়েছেন তাই এই মহামারী। ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য সে কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা-আরাধনা করত। কিন্তু রোগের কারণ ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রচলিত ভাববাদী বিশ্বাসগুলি তার রোগমুক্তি ঘটাতে পারেনি বরং বস্তুনিষ্ঠ কারণ অনুসন্ধানে প্ররোচিত করে। লক্ষ লক্ষ বছরের দীর্ঘ জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতিতে ঘটে চলা ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে থাকে। রোগমুক্তির উপায়গুলি প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে এই বিশ্বাস মানুষের চেতনায় উদয় হয়। তারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রচলন ঘটতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রীক, ব্যাবেলনীয় সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা তা জানতে পারি। এমনকি শল্য চিকিৎসার অনুশীলন সংক্রান্ত বহু প্রমাণও পাওয়া যায়। 'শুশ্রত সংহিতা'য় ১২৫ রকমের শল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু গাছপালার গুণাগুণ সম্বন্ধেও মানুষের সম্যক জ্ঞান ছিল। আয়ুর্বেদ ও শল্য চিকিৎসায় পারদর্শি লোকজন রাজাদের আনুকূল্যে রাজদরবারে রাজ বৈদ্য হিসাবে নিযুক্ত হতেন। তাই সে যুগের সম্ভাব্য সেরা চিকিৎসা ভোগ করার অধিকার ছিল কেবলমাত্র রাজন্যবর্গেরই।

কিন্তু, সেযুগের চিকিৎসাশাস্ত্র মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। গাছ-গাছড়ার গুণাগুন সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জ্ঞানই ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের

ভিত্তি। সমাজব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশের সাথে সাথে, মানবশরীর ও বিভিন্ন রোগের কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ হতে থাকে। বর্তমানে তার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতালব্ধ নয় বরং বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে প্রাপ্ত সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম চিকিৎসাশাস্ত্র ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে। এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির দৌলতেই মানুষ অধিকাংশ রোগের কারণ ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে জেনেছে এবং সেই জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগ করে জীবনকে জয় করার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। একদিন যে রোগ ছিল মানুষের কাছে বিভীষিকা, সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামিল, আজ বিজ্ঞানের দৌলতে তাকে নির্মূল করা সম্ভব হলেও প্রশ্ন জাগে বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় উন্নতির যুগে জন সমাজে কেন বারে বারে ফিরে আসে সেই মহামারীর আতঙ্ক? পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু নামক মারণরোগ গুলি নির্মূল হলেও, বহুদেশে আবার তা কেন ফিরে আসছে? (যদিও নিন্দুকেরা বলেন ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে) জনস্বাস্থ্য পরিচালন ব্যবস্থার সর্বোতম বিজ্ঞানিক আবিষ্কার জানা থাকা সত্বেও, জলবাহিত রোগ যেমন কলেরা, জণ্ডিস-ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব কেন উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে? কেনই বা বিশুদ্ধ পানীয়জল সরাবরাহে সরকারী গাফিলতি দেখা যায়? অথচ পয়সা খরচ করলেই বাজারে মেলে বিশুদ্ধজল? এই বৈপরীত্য বুঝে নেবার সময় এসেছে আজ।

আসলে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগ সমস্ত মানব-জাতির সম্পদ হলেও তার অধিকার সমস্ত মানব জাতির নেই। বর্তমান সমাজে রোগ ও তার চিকিৎসা হল ক্রয় যোগ্য পণ্য। তাই আপামর মানুষের জন্য রয়েছে তা ক্রয় করার অধিকার। আর যেহেতু সমাজের বেশীরভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই তাই তাদের প্রায় বিনাচিকিৎসায় মরতে হয়। এই বৈষম্য মানুষ মুখ বুজে মেনে নেয়নি বরং 'স্বাস্থ্য সামাজিক-অধিকার' এই দাবীতে দেশে বিদেশে গণ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। ■

বিজ্ঞপ্তি ১

অনিবার্য কারণে 'শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিজ্ঞান' ধারাবাহিক রচনাটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। এই কারণে আমরা দুঃখিত। – সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি ২

সকল পাঠক বন্ধুর কাছে আবেদন, আপনারা পত্রিকার রচনা সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত সমালোচনা পাঠান। বিজ্ঞান ও কুসংস্কার বিষয়ক রচনা, রিপোর্ট পাঠান। রচনা পরিষ্কার হরফে, পাতার একদিকে লিখে পাঠাবেন এবং কপি রেখে পাঠাবেন। কবিতা ও রচনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। – সম্পাদক

বিজ্ঞান মনস্ক গ্রামে বা শহরে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান করে থাকে। আপনার এলাকায় কুসংস্কার বা সামাজিক অন্যায়ের ঘটনা ঘটলে আমরা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন, অন্যায় দূর করার কাজে সহযোগিতা করে থাকি।

যোগাযোগের ঠিকানা

নন্দা মুখার্জী ঃ ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, ফোন - ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫

Email : samikshan2009@gmail.com

ট্রান্সিট অফ ভেনাস

নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) প্রথম বলেন-সূর্য স্থির, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলি তার চারিদিকে আবর্তনরত। তার আগে ধারণা ছিল পৃথিবীই বোধহয় স্থির এবং তাকে কেন্দ্র করেই সূর্য ও বাকি গ্রহগুলি ক্রমাগত চারিপাশে ঘুরছে। এই Geo-centric অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বাকিদের আবর্তনের ঘটনাকে মেনে চলার পিছনে কারণ ছিল এই যে পৃথিবীতে বসে তো পৃথিবীকে স্থির বলেই মনে হয় এবং বাকিদের গতিশীল। কোপারনিকাস ঠিক এই জায়গাতেই আপত্তি তোলেন। তাঁর লেখা বইটিতে তিনি জানান 'গ্রহগুলির এই অদ্ভুত গতিকে তখনই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যখন পৃথিবীকে গতিশীল হিসাবে ভাবা যাবে'। কিন্তু তাঁর লেখা এই মূল্যবান বইটিকে চার্চ তৎক্ষণাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

কিন্তু সেই চার্চেরই এক অল্পবয়সী যুবক সন্ন্যাসী (Monk) লাইব্রেরী থেকে বইটি খুঁজে পান, পড়েন, তারপরই ঘটে যায় বিপর্যয়। চার্চের সন্ন্যাসী হয়েও তিনি কোপারনিকাসের যুক্তিগ্রাহ্য মতামতকে গ্রহণ করে ফেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একধাপ বেশীই ভূমিকা রাখতে যান। অর্থাৎ তিনি জানাতে চান সর্বসাধারণকে এই আবিস্কৃত সত্যের ব্যাপারে। চার্চ তাঁকে ছেড়ে কথা বলে না। শুধু এই আচরণের জন্যই তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে খুন করা হয়। সেই মহান যুবকটির নাম জিওর্দানো ব্রুনো।

কোপারনিকাসের এই বক্তব্যকে পরবর্তীকালে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) পূর্ণ সমর্থন করেন এবং তিনি তাঁর নিজের আবিস্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে আলাদা আলাদা করে গ্রহ ও উপগ্রহগুলির ঘূর্ণায়মাণ গতি দেখে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। গ্যালিলিওর এই বক্তব্য ততদিনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিজ্ঞানী মহলে এনিয়ে চর্চার দ্বার খুলে যায়।

অন্যদিকে টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) নামক এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রহগুলির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানকে লিপিবদ্ধ করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকারী জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) সেই সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য গুলোকে বিশ্লেষণ করা শুরু করেন। বহুবছরের কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের পর তিনি গ্রহগুলির গতি বিষয়ক একটি সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেন যার নাম রাখা হয় 'কেপলারের সূত্র'।

এরপর আসে সেই ঐতিহাসিক সময় যেখানে আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) তাঁর 'সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র' আবিষ্কার করেন। এর মাধ্যমে তিনি বলেন যে এই মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুদুটির নিজস্ব ভরের ওপর। একই সাথে আকর্ষণ বলটি বস্তু দুটির মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়। নিউটনের এই সূত্র থেকে কেপলারের গ্রহসূত্রকেও গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। যেহেতু কেপলারের সূত্র তাঁর গুরু টাইকো ব্রাহের সুনিপুণ পর্যবেক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলই তা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আরো মজবুত ভিত্তি পেয়ে যায়। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য কেপলারের সূত্রেরও কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং দেখানো হয় সৌরজগতের গ্রহগুলি সূর্যকে যে উপবৃত্তীয় পথে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথটির তলও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। যাইহোক সেই সময়কার এই দুটি মজবুত সূত্রের সাহায্যে মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। বিভিন্ন গ্রহগুলির মধ্যে এবং গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যেকার আকর্ষণ বলকে নির্ণয় করে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থান কিরকম হবে তা বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুমান করা সম্ভব হয়। তার ফলে সৌরজগতের গঠন সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়। সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলি সূর্যের পারস্পরিক আকর্ষণ বলের প্রভাবেই যে তার চারিদিকে ঘুরছে এবং কখনো নির্দিষ্ট কক্ষপথ ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারছে না-এই জ্ঞান থেকেই ভবিষ্যতে তারা একে অপরের সাপেক্ষে কোন কোন অবস্থানে থাকবে তা অঙ্ক কষে অনেকদূর মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

এবার ফিরে আসা যাক বর্তমান পরিস্থিতিতে। বিগত ৬ই জুন ২০১২তে ঠিক এই নিয়মেই ঘটনাক্রমে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চলে আসে শুক্রগ্রহ এবং পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখি বিরাট সূর্যের গায়ে ছোট্ট একটি কালো স্পট ক্রমাগত সরছে থাকছে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী মহলের তুমূল আলোচনা ও কৌতূহল সংবাদ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মনেও কৌতূহল তৈরী করে। ইংরাজিতে এই ঘটনাকে 'ট্রান্সিট অফ ভেনাস' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেননা ভেনাস মানে হল শুক্রগ্রহ এবং ট্রান্সিট কথার মানে আমরা জানি মধ্যরেখার ওপর দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গমন বোঝায়। অর্থাৎ সূর্যের প্রায় মাঝখান দিয়ে শুক্রগ্রহের গমন। শুক্রগ্রহ সূর্যের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট বলে তাকে ছোট কালো স্পট হিসাবে দেখা গেছে। শুধু ছোট বলেই যে ছোট দেখিয়েছে ব্যাপারটা এমনও নয়। চাঁদওতো সূর্যের তুলনায় অনেক ছোট। তবুও তা পৃথিবীর অনেক কাছে অবস্থান করে বলে আমরা পৃথিবী থেকে চন্দ্রগ্রহণ বা চাঁদ দ্বারা সূর্যের পূর্ণ ঢেকে যাওয়ার ঘটনাকে দেখতে পারি। শুক্রগ্রহ, পৃথিবীর

চেয়ে অনেক বেশী দূরে বলেই তাকে ছোট দেখিয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে এই ঘটনা পৃথিবী থেকে আবার নাকি দেখা যাবে ১০৫ বছর পরে অর্থাৎ ২১১৭ সালে। তাই এই অমূল্য ঘটনার সাক্ষী হতেই বহুমানুষের উৎসাহ তৈরী হয় ৬ই জুন তারিখে। আসুন দেখি ঘটনাটি সাধারণভাবে কি, কেনই বা এই ঘটনা আবার ১০৫ বছর পর দেখা যাবে এবং সাধারণ মানুষের মনেই বা এই নিয়ে কি প্রতিক্রিয়া।

সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে এক একটি কক্ষপথে সূর্যকে এক-একরকম গতি নিয়ে প্রদক্ষিণ করে। যেমন শুক্রগ্রহের কক্ষপথটি সূর্যের অনেক কাছে পৃথিবীর কক্ষপথের তুলনায়। তাই সর্বদাই সূর্য ও পৃথিবীর কক্ষপথের মাঝে শুক্রগ্রহের অবস্থান থাকে। দুটি গ্রহের কক্ষপথের তল কিন্তু আলাদা হয়। যেমন বর্তমানে আমরা জানি যে দুটি তলের মধ্যে কোণ ৩.৩৯ ডিগ্রি। এটিও আবার ধ্রুবক নয়। পৃথিবী নিজের কক্ষপথের তল বারবার পরিবর্তন করে এবং শুক্রগ্রহের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এখন আপনিই ভেবে দেখুন যে পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহকে সূর্যের ঠিক উপরে তখনই দেখা সম্ভব যখন সূর্য ও পৃথিবী এবং সূর্য ও শুক্রগ্রহের কাল্পনিক তলদুটির ছেদরেখাটির (Line of intersection) ওপর পৃথিবী ও শুক্রগ্রহ উভয়ের অবস্থান হবে। অর্থাৎ সূর্য, শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী এই পরস্পরা অনুযায়ী একই সরলরেখায় অবস্থান করবে। তখন পৃথিবী থেকে কেউ সূর্যের দিকে তাকালেই মাঝে ছোট কালো স্পট হিসাবে শুক্রগ্রহকে দেখতে পাবেন। যেহেতু পৃথিবী ও শুক্রগ্রহ দুটোই গতিশীল, তাই আমরা দেখেছি সূর্যের ওপর এই কালো স্পটটি ক্রমাগত বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরতে সরতে এক সময়ে সূর্যের গোলাকার অংশ (Disc of Sun) ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গেছে মানেই হল সূর্য, শুক্রগ্রহ এবং পৃথিবী এক সরল রেখায় আর নেই। তাদের কক্ষপথের তল অনুযায়ী তারা অন্য অন্য অবস্থানে চলে গেছে। তাই পৃথিবীর বুক থেকে এঘটনা দেখা কিছু সময়ের জন্যই সম্ভব, রোজ রোজ দেখা যায় না বলেই তার এত চাহিদা। কিন্তু ঘটনাটা কি সত্যিই অতি প্রাকৃতিক ঘটনা, ভেবে দেখুন সূর্য ও শুক্রগ্রহের মাঝে সংযোগকারী কাল্পনিক সরলরেখাতে যদি আপনি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকতেন শুক্রগ্রহকে মাঝে রেখে তাহলে তো এই সময়েও সেই দুর্লভ ঘটনাটির সাক্ষী হতে পারতেন, এবং যদি আপনি সর্বদা এমনভাবে গতিশীল থাকতেন যাতে সূর্য, শুক্রগ্রহ ও আপনি একই সরলরেখায় থাকেন তাহলে আপনি সর্বদাই 'ট্রান্সিট অফ ভেনাস'-এর সাক্ষী হতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে মহাশূন্যের মধ্যে গতিশীল অবস্থায় থাকতে হত, পৃথিবীতে থাকা চলতো না। তাই ট্রান্সিট অফ ভেনাস জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫.২৫৬ দিনে এবং শুক্রগ্রহ প্রদক্ষিণ করে ২২৪.৭০১ দিনে। যদি বোঝার সুবিধার্থে এটা ধরে নেওয়া হয় যে তাদের কক্ষপথের তলগুলো স্থির, তাহলে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে শুরু করে সেই অবস্থানেই আবার ফিরে আসতে পৃথিবীর ন্যূনতম সময় লাগবে ৩৬৫.২৫৬ দিন যেখানে শুক্রগ্রহের লাগবে ২২৪.৭০১ দিন। তাই একবার সূর্য, শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করার পর আবার একই সরলরেখায় অবস্থান করতে ন্যূনতম সময় লাগবে ২৯২২ দিন যা ৩৬৫.২৫৬ ও ২২৪.৭০১-এই দুটি সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক। পৃথিবীর বছর হিসাবে ২৯২২ দিনকে বছরে রূপান্তরিত করলে ৮বছর মতো আসে। তাই একবার 'ট্রান্সিট অফ ভেনাস'-এর ঘটনার পর আবার পৃথিবী থেকে ৮বছর পর তা দেখা যায়। যেমন ২০০৪ সালের ৮ই জুন-এর পর ঘটনাটি আবার ঘটল ৬ই জুন,২০১২তে। বাস্তবে যেহেতু কক্ষপথের তল পরিবর্তনশীল এবং অন্যান্য বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্রের মহাকর্ষবল প্রতিটি গ্রহের উপর ক্রিয়াশীল তাই প্রকৃতক্ষেত্রে এই ঘটনার পর্যায়ক্রমটি সবসময়ে ৮বছর না হয়ে একবার দীর্ঘকালীন (১২১.৫ বছর ও ১০৫.৫ বছর) এবং স্বল্পকালীন (৮ বছর) হয়। যেমন ১৬৩১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পর আবার তা দেখা গেল ৮ বছর পরেই, অর্থাৎ ১৬৩৯ সালের ৪ই ডিসেম্বর। তারপর ১২১.৫ বছরের একটা লম্বা ফাঁক। পরের ঘটনা ঘটে ১৭৬১ সালের ৬ই জুন। আবার ৮ বছরের ফাঁক অর্থাৎ ১৭৬৯ সালের ৩রা জুন। কিন্তু তারপরের দীর্ঘপর্যায়টি হয় ১০৫.৫ বছর পর ১৮৭৪-এর ৯ই ডিসেম্বর। এরপর আবার ৮ বছরের ব্যবধান। মানে ১৮৮২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। ফের ফিরে আসে ১২১.৫ বছরের ব্যবধান যা ২০০৪ সালের ৮ই জুন ঘটে। অর্থাৎ এককথায় পর্যায়ক্রমটা ... ১২১–৮–১০৫–৮–১২১.... এই রকমভাবে চলে। যেহেতু ঠিক আগের দীর্ঘ পর্যায়টি ছিল ১২১.৫ বছরের তাই পরবর্ত্তী দীর্ঘ পর্যায়টি কিন্তু হবে ১০৫.৫ বছরের। তাই বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে পরবর্তীতে আবার ২১১৭ সালে পৃথিবী থেকে দেখা সম্ভব হবে এই দুর্লভ ঘটনা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আজ প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের এই রচনার সূচনাতেই আমরা সমস্ত পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই সমস্ত ঘটনাগুলি বৈজ্ঞানিক মহলে চরম উত্তেজনা ও কৌতূহল তৈরী করে। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মানুষকে ভাববাদী কাল্পনিক রূপকথা থেকে বাস্তবে নামিয়ে আনে এবং মানবসভ্যতার বিকাশের পথকে সুনিশ্চিত করে। একথা সত্য যে বিজ্ঞানীদের সবতত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হওয়ায় হয়ত সাধারণ জনগণ তার সেই গুরুত্ব অনুধাবণ করতে পারে না।

তাই বর্তমানে ট্রান্সিট অফ ভেনাস-এর ঘটনাকে তারা নিছকই প্রচারমূলক কৌতূহল মেটানোর জায়গা থেকে দেখেছে। তাদের এই কৌতূহল সূর্যের দিকে তাকানোর বিশেষ চশমা বিক্রির ব্যাপক বাজার তৈরী করেছিল যা আমরা বিগত পর্যায়ের সূর্যগ্রহণগুলির সময়ও দেখেছিলাম। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাকে বিষয় করে নিক লম্ব রচিত 'Transit of Venus, 1631 to the present'নামক একটি বই প্রকাশিত হল ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে ঘটনার ঠিক কিছু মাস পূর্বে। বাজার চাঙ্গা থাকায় বইটি ভালো রকম আর্থিক লাভ এনে দেয়। আমরা যদি ধরেও নিই জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা এমন শিক্ষা কি এককালীন ভাবেই দেওয়া উচিত? আলোচ্য ঘটনাটি তো মহাকর্ষ বিদ্যার বাইরে কিছু না, তাহলে জনগণের সংস্কার গুলো দূর করে তাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া তো চিরকালীন ব্যাপার। তাই নয় কি?

যাই হোক সব শেষে একটি কথাই বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলোকে সাধারণ জনগণ বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করবে, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে স্থান দেবে না–এ বড় আনন্দের চাহিদা বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠনের কাছে। কিন্তু সমাজচালকদের যদি তা স্বার্থে আঘাত করে, তাহলে তার পরিণতি ব্রুনোর পরিণতির মতোই অমানবিক হয়। সমাজে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস কাদের স্বার্থে টিকে আছে সে প্রশ্ন যদিও এই লেখার বিষয় নয় তবুও তার অনুসন্ধান করলেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন 'ট্রান্সিট অফ ভেনাস' নিয়ে জনগণের মধ্যে এত উৎসাহ সৃষ্টি করা সত্যিই তাদেরকে সংস্কার মুক্ত করার জন্য? ■

পাঠকের কলম

বেঁচে থাক মশা, বেঁচে থাক রোগ, বেঁচে থাক ব্যবসা!

হঠাৎ করে কলকাতার দুর্যোগ – ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার আবির্ভাব সাথে ম্যালেরিয়া। ডেঙ্গু আবার কোলাবোরেশন করেছে আরও দু'তিনটি ভাইরাস কোম্পানীর সাথে। ফলে চিকিৎসা বিভ্রাটে ডাক্তার ও রুগী। ইতিমধ্যে ডেঙ্গু প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে বেশ কয়েকজন মানুষের। কিন্তু হঠাৎ এই রোগের সূত্রপাত কেন? দু'তিনটি রোগের ভাইরাস কী নিজেরাই কোলাবরেশান চুক্তি করে নিল? এমন প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক।

নোংরা আবর্জনা যতই থাক, তার মধ্যে থেকে ভাইরাস বা রোগবাহী জীবাণু স্বয়ম্ভুর মতো আপনা-আপনি জন্মায় না। বহুদিন আগে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর পরীক্ষা করে এটা প্রমাণ করেছিলেন। অর্থাৎ হঠাৎ করে নিজে নিজেই কলকাতার ময়লা জল বা আবর্জনা থেকে ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়ার মতো ভাইরাস জন্মায় নি। হতে পারে ময়লা বা দূষিত পরিবেশ রোগ ছড়ানোর অনুকূলে কাজ করে।

তাহলে হঠাৎ করে এক একটি স্থানে এক একটি রোগ মাঝে মাঝে চাগাড় দিচ্ছে কেন এবং সেই সব রোগের ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার চরিত্র এত জটিল হয়ে উঠছে কেন?

প্রথমে দেখা যা, ডেঙ্গু কী জাতীয় রোগ। ডেঙ্গু হল ভাইরাস ঘটিত রোগ যা মশা দ্বারা সংক্রামিত হয়। তাহলে, ডেঙ্গু হবার প্রাথমিক শর্ত হল। একটি মশার দেহে (রক্তে) এই রোগের ভাইরাস থাকতে হবে যে, মশাটির দংশনে কোনো মানুষ এই ভাইরাসে সংক্রামিত হবে। এরপরের বিষয় হল, তাহলে মশাটির ডেঙ্গু ভাইরাস পেল কোথা থেকে? তার শরীরে ঐ ভাইরাস ঢুকলো কী করে?

(রক্তে) ভাইরাস যে ভাবেই প্রবেশ করুক, এই তালে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে মশা মারার কয়েল, ম্যাট, লিক্যুইড বা মলমের ব্যবসা। ঝিমিয়ে পড়া এই প্রোডাক্টগুলির এখন রমরমা বাজার। দোকানদাররা শয়ে শয়ে খদ্দেরকে ফেরাতে বাধ্য হচ্ছেন অত সাপ্লাই নেই বলে। সাপ্লাই বাড়ানোর চাপও বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং বেঁচে থাক মশা, বেঁচে থাক রোগ আর বেঁচে থাক ব্যবসা। কয়েকজন মানুষ না হয় মারাই গেল!

– কিশোর নাগ
জলপাইগুড়ি

[পাঠককে সময়োপযোগী ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ। এ বিষয় বিজ্ঞান সম্মত রচনা ভবিষ্যতে রাখার প্রয়াস থাকবে। – সম্পাদক]

অশোক সেন ও ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ

রাশিয়ান পুঁজিপতি ইউরি মিলনার-এর 'ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ ফাউন্ডেশেন' নামে একটি সংস্থা এবছর থেকে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছে যার অর্থমূল্য নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেয়েও বেশী। যদিও নোবেল পুরস্কারের চেয়ে বেশী অর্থমূল্যের পুরস্কার আগেই প্রচলিত ছিল, যার নাম 'টেমপ্লেটন প্রাইজ ফর প্রোগ্রেস ইন রিলিজিয়ন'। যে সমস্ত বিজ্ঞানী আধ্যাত্মবাদ-কে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে এনেছেন তাঁদের জন্যই এই বিপুল ১.৭ মিলিয়ন ডলারের টেমপ্লেট পুরস্কার। যেখানে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১.২ মিলিয়ন ডলার সেখানে এবছর চালু হওয়া ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ-এর অর্থমূল্য ৩ মিলিয়ন ডলার। মিলনার সারা পৃথিবী থেকে সর্বমোট নয়জন বিজ্ঞানীকে দিয়েছেন এই পুরস্কার, যাঁদের মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে এলাহাবাদ হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক অশোক সেনও রয়েছেন। শ্রী সেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর কানপুর আই আই টি থেকে মাস্টার ডিগ্রী করেন। তারপর চলে যান নিউ ইয়র্কে ডক্টরেট ডিগ্রী পেতে। বর্তমানে তিনি স্ট্রিং থিওরি নিয়ে কাজ করছেন হরিশচন্দ্র ইনস্টিটিউটে।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকেই বিজ্ঞানী মহল বুঝতে পারে যে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের সাহায্যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে খুব ছোট বস্তুর (যেমন একটা পরমাণু) বৈশিষ্ট্যগুলোকে তা একেবারেই ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই প্রয়োজন ছিল একটি নতুন তত্ত্বের যা সাধারণভাবে সমস্ত বস্তুর জন্য প্রযোজ্য। এখান থেকেই জন্ম হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স–এর। প্রকৃতিতে যে চার রকমের বল দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ১) মহাকর্ষ বল, ২) তড়িৎ চুম্বকীয় বল, ৩) উইক ফোর্স এবং ৪) স্ট্রং ফোর্স, এর মধ্যে শেষ তিনটিকে একটি কমন ফ্রেমওয়ার্ক-এ ব্যাখ্যা করা যায় কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা। শুধু মহাকর্ষকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করে যে তত্ত্ব তা হল আইনস্টাইনের 'জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি'। কিন্তু এটা একটা ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং জেনারেল রিলেটিভিটি – এই দুটোকে একই ফ্রেমওয়ার্ক-এর মধ্যে ব্যাখ্যা করা আজও সম্ভব হয়নি। এরই চেষ্টা বিজ্ঞানীরা এখন করে চলেছেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই 'স্ট্রিং থিওরি'র জন্ম। তবে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আরও কিছু থিওরি আছে, যেমন 'লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি'। প্রতিটি তত্ত্বেরই নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে এখনো। এগুলি ঠিক না ভুল তা নির্ণয় করার জন্য যে পরীক্ষা করা দরকার তা প্রযুক্তিগতভাবে এখনও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

তবে এখনও 'এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফায়েড' না হলেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এদের নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার। তাই এই গবেষণাকে ঘোষিতভাবে উৎসাহ দিতেই মিলনার এই পুরস্কার চালু করেছেন। এবছর তিনি নিজেই পুরস্কার প্রাপকদেরকে বিশ্বজুড়ে খুঁজে বের করেছেন। নয়জন বিজ্ঞানীকে এবছর এই ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। পরের বছর এবছরের প্রাপকরাই হবেন বিচারক এবং তাঁরাই নির্বাচন করবেন ভবিষ্যতের পুরস্কার প্রাপকদের নাম।

এবছরের নয়জন পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় স্ট্রিং থিওরিস্টদের পাশাপাশি অন্যান্য কিছু বিষয়ে কাজ করছেন এমন বিজ্ঞানীরাও আছেন। এর মধ্যে অ্যালেক্সি কিটা কাজ করছেন কোয়ান্টাম কম্পিউটেশনের ওপর। আমরা বর্তমানে যে কম্পিউটারগুলো দেখি সেগুলো সবই ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার। কোয়ান্টাম কম্পিউটেশনের লক্ষ্য হল কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরী করা যা কিনা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের তুলনায় হবে অনেক বেশী শক্তিশালী। তথ্য আদানপ্রদানে গোপনীয়তাও হবে সুনিশ্চিত। এর তাত্ত্বিক বিকাশের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত উন্নতি।

হঠাৎ করে কেন এই পুরস্কার এবং তাও এমনই অর্থমূল্যে যা এযাবৎ পর্যন্ত সর্বাধিক – এ নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর সবসময় জনগণের কাছে পরিস্কার থাকে না। তবে এবিষয়ে পুরস্কার প্রাপক শ্রী সেন মন্তব্য করেন, 'আমার কাছে পুরস্কারের খবরটা সত্যিই এক বিস্ময়। আমি মনে করি এই পুরস্কারের ঘোষণা ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স-এর আগামী ছাত্র গবেষকদের কাছে প্রেরণা দায়ক ব্যাপার হবে। ■

পূর্ব বড়িষা অঞ্চলে জন্ডিস সংক্রমণ ঃ একটি অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট

[পূর্ব বড়িষা অঞ্চলে জন্ডিস সংক্রমণ বিষয়ক সমীক্ষাটি চালাতে গিয়ে বহু পরিবারের বহু মানুষের সাথে কথা বলা হয়। সমস্ত কথোপকথন তুলে ধরা সম্ভব হল না লেখাটির পরিসরের কথা এবং একই প্রকার বক্তব্যর পুনরাবৃত্তির ত্রুটিকে মাথায় রেখে।]

অসুখ। শুনলেই মনে হয় ওষুধ, ডাক্তার, হাসপাতাল ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে কখনো ভেবে দেখেছেন যে অসুখ থেকে 'অ'কে বাদ দিলে 'সুখ' পড়ে থাকে, যার মানে তার উল্টো। অর্থাৎ মানুষের জীবনে সুখ হারানোকেই বলে অসুখ। কোনো কারণে আপনার মন খারাপ, সেটাও আসলে আপনার অসুখ। মনের অসুখ। মনের অসুখে মন ভালো না থাকায় খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো না করার ফলে শারীরিক অসুখও দেখা দেয়। আবার শরীর খারাপ হলে মনে ওপরও এর প্রভাব পড়ে। তাই অসুখের এই দুই রকমফের একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

তাই কারোর অসুখ করাটা স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক নিয়মেই সে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যখন একই অসুখ ঘরে ঘরে প্রায় প্রতিটি মানুষকেই কাবু করে ফেলে তখন সত্যিই তা চিন্তার বিষয়। রোগটি তখন মহামারীর রূপ ধারণ করে এবং রোগটির চেয়েও তার সংক্রমণের বিষয়টি বেশী চিন্তার কারণ হয়।

ঠিক এমনই একটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেল বেহালা ঠাকুরপুকুরের পূর্ববড়িষা অঞ্চলের খালপাড় ও তার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায়। বিজ্ঞানমনস্কর কাছে খবর এল যে ঐ অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ঘরে মানুষের জন্ডিস হচ্ছে এবং কেউ কেউ নাকি প্রাণও হারিয়েছেন। এ খবর পাওয়ামাত্র আমরা ঠিক করলাম যে আমরা বিজ্ঞান মনস্কর অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এই ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা রাখব। যেহেতু ঘটনা সম্পর্কে আমরা ততটা ওয়াকিবহাল ছিলাম না এবং প্রাথমিক খবরটা কানে শোনা ছিল তাই আমরা ঠিক করলাম বিজ্ঞান মনস্কর বেহালা অঞ্চলের সদস্যদের মধ্যে টীম করে প্রায় প্রতিদিন আমরা খালপাড় অঞ্চলে যাব এবং প্রতিটি পরিবারের দরজায় টোকা মেরে ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের অভিমত জানতে চাইব। স্থানীয় মানুষ কী চোখে দেখছেন গোটা সমস্যাটিকে তা জানা খুব প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন উঠল জানব কিভাবে। ঠিক কি কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনাটি সম্পর্কে সার্বিক জানা হবে এবং মানুষের চোখে এর সমাধানটিকেও আমরা বের করে আনব? অবশেষে স্থির হল সমীক্ষা শুরু করার আগেই আমাদের একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করে ফেলতে হবে। এই প্রশ্নগুলোর নিরীখেই চলবে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ। সেই মতো মূল্যবান বারোটি প্রশ্নের একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করে আমরা পৌঁছলাম ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বড়িষা পূর্ব পাড়া রোডের দিলীপ মন্ডলের বাড়িতে।

আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলীপবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম – 'বাড়িতে জলের এবং পানীয় জলের উৎস কি?' উনি জানালেন যে কর্পোরেশনের জলই মূলত ঐ এলাকার ঘরে ঘরে জলের উৎস, তবে ওনারা পানীয় জল হিসাবে টিউবওয়েলের জলই ব্যবহার করেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রশ্ন ছিল – এর কারণ কি, কেননা ঘরে ঘরে কর্পোরেশন তো আমাদের পানীয় জলই সরবরাহ করে। দিলীপবাবু আমাদের কথার বিরোধিতা করে বললেন, 'কর্পোরেশনের জল থেকে পোকা, নোংরা ও দুর্গন্ধ বেরোলে আমরা খাব কিভাবে সেই জল!' বাড়িতে কারোর জন্ডিস হয়েছিল কিনা এ পর্যায়ে জানতে চাওয়ায় উনি না বললেন। সেই সুবাদে আমাদের জন্ডিস সম্পর্কিত পরবর্তী প্রশ্নগুলো আর তাঁকে করার কোনো তাৎপর্য্য থাকে না। এই ভেবে আমরা পরের পরিবারটির দিকে পা বাড়ালাম। কর্পোরেশনের জলের ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি একই ধরনের কথা বলতে লাগলেন। আমরা বেশ কয়েকটি বাড়ির পর যখন কাকলি প্রধানের বাড়ি পৌঁছলাম তখন কাকলি দেবী আমাদের জানালেন যে তাঁদের পরিবারে কারোর জন্ডিস না হলেও খালপাড়ের দিকে আরও কিছুটা এগোলে আমরা

জন্ডিস সংক্রমণ অঞ্চলে পৌঁছোবো। কর্পোরেশন থেকে সরবরাহ করা পানীয় জল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনিও একই অশুদ্ধতার কথা উল্লেখ করলেন। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করি – 'বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার কি উপায় হওয়া উচিত?' তিনি পরিস্কারভাবে জানালেন – 'কর্পোরেশনের জল খুবই নোংরা। তাই বাধ্য হয়ে ডিপ টিউবওয়েলের জল খেতে হয়। কিন্তু কর্পোরেশনের জল ভালো হওয়া উচিত ছিল। তাহলে তো টাইম কলের জলই খাওয়া যেত। তাই যেখান থেকে জল আসে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তা নিয়মিত দেখাশোনা করা উচিত।' আমরা জানলাম কর্পোরেশনের জল সরবরাহের চিত্র স্থানীয় অঞ্চলটিতে মোটেও ভালো নয়। সমীক্ষা শেষের দিকে রূপা দেবীর সাথে কথা বলে জানা গেল যে সেই অঞ্চলে নাকি কর্পোরেশনের জলের লাইনই আসেনি। যাই হোক আমরা বুঝলাম জন্ডিস আক্রান্ত এলাকায় পৌঁছতে গেলে আমাদের খালপাড়ের আরো কাছাকাছি যেতে হবে।

দ্বিতীয় দিন আমাদের টীম সরাসরি খালপাড় অঞ্চলে পৌঁছোয় এবং সেখান থেকেই সমীক্ষা শুরু করে। অঞ্চলের একধার দিয়ে লম্বা খাল চলে গেছে। তাতে সমস্ত রকমের ময়লা আবর্জনার ছড়াছড়ি। খালের একদিকে পরপর বাড়িগুলো। দ্বিতীয় দিনের কথোপকথনে টাইম কলের জলে নোংরা পোকামাকড়ের অবস্থান ছাড়াও আরো দুটি বিষয় বেরিয়ে এল। এক, সমস্ত পাড়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে মাত্র দুটি টাইম কল এবং দুই, টাইম কলের জলের চাপ অস্বাভাবিক মাত্রায় কম। স্থানীয় এক মহিলা বললেন – 'সকালের দিকে তাও জলের গতি কিছুটা থাকলেও, সন্ধ্যেবেলায় যখন বেটাইমে (নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী সময়) জল আসে তখন তা টিপটিপ করে সরু জলধারার মতো পড়ে। পনেরো-কুড়ি মিনিট লেগে যায় এক বালতি জল ভরতে।' একটি পরিবারে পাঁচজন সদস্য হলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জল বেশী লাগে। তার ওপর জলের কল মাত্র দুটো হলে জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে অনেকেই তা বুঝতে পারবেন। অঞ্চলটিতে বেশীরভাগই অ্যাসবেস্টসের ছাদওয়ালা বেড়ার ঘর, মাঝে কিছু পাকা বাড়িও আছে। দশটি পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারলাম প্রায় প্রত্যেকের ঘরেতেই কিছু মাস আগে জন্ডিস হয়ে গেছে। স্থানীয় উজ্জ্বলা কর্মকার আমাদের জানালেন তাঁর ছোট ছেলের জন্ডিস হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের কাছেই একটি বেসরকারী নার্সিংহোম-এ ভর্তি করানো হয় ১লা জানুয়ারিতে। এখনো তার চিকিৎসা চলছে। বারবার বিলিরুবিন পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে তা কত মাত্রায় নামল।

আমরা জানি শরীরে বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকেই জন্ডিস বলে। নানা কারণে তা ঘটতে পারে। তাই জন্ডিস হল ফল বা লক্ষণ মাত্র। তা যাই হোক আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেদিন পাওয়া গেল যে দাগারমাঠ এলাকায় প্রচুর মানুষের জন্ডিস হয়েছে। টাইম কলের পানীয় জলের মান যে অত্যন্ত খারাপ সে বিষয়ে প্রতিটি বাড়িতে শুনতে শুনতে আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম যে মানুষের দাবী – অবিলম্বে কর্পোরেশনের তা ঠিক করা দরকার। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই আমরা এমন একটি পরিবারের কাছে পৌঁছলাম যে পরিবারটির ভিতটিকেই নাড়িয়ে দিয়েছে এই মহামারী আকারধারী জন্ডিস। পরিবারের কর্ত্রী শ্রীমতি সাধনা কর্মকার আমাদের জানালেন যে আগে তাঁরা টাইম কলের জলই খেতেন, বর্তমানে টিউবওয়েলের জল খান। বাড়িতে ওনার ছোট বৌমা যিনি কিনা ওনার মেয়ের মতই ছিলেন তিনি জন্ডিসে আক্রান্ত হন এবং অবশেষে মারা যান ১৮ই জানুয়ারী, ২০১২তে। ঐ সময়ে তিনি সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ফলে একসাথে শেষ হয়ে যায় দু-দুটি তরতাজা প্রাণ। 'পিয়ালির হেপাটাইটিস-ই হয়েছিল, আমরা ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। রিপোর্টে তাই এসেছিল। ঐ দুর্ঘটনার পর আমরা জল ফুটিয়ে খাই এবং ফিল্টার করেও খাই। তবে যে যাবার সে তো চলেই গেছে।' আমরা সাধনা দেবীর কাছে জানতে চাইলাম যে এত বড় অঞ্চল জুড়ে ঘরে ঘরে জন্ডিস হওয়ার কারণটা কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়। 'কর্পোরেশনের জলের পাইপ যেখানে সেখানে ফেটে বসে আছে, ঠিকমতো সারাই হয় না, কর্পোরেশনের লোক দেখবে। আমরা আর কি করতে পারি!' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঐ একই অঞ্চলে কয়েকটি বাড়ি পরেই ছবি দেবীর বাড়ি। ওনার ২৩ বছরের ছেলে সদ্য বিয়ে করেছিলেন। তাকেও প্রাণ দিতে হয়েছে এই জন্ডিসের কারণেই।

একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন, একটা বিস্তীর্ণ এলাকা, সেখানে ঘরে ঘরে দু-একজন করে জন্ডিস হচ্ছে। এর কারণ কি হতে পারে? সবাইয়ের একসাথে মশার কামড়ে

ম্যালেরিয়া হয়েছে বলে বিলিরুবিন বেড়ে গিয়ে জন্ডিস হয়েছে, নাকি সক্কলের অন্য কোন বংশগত রোগ আছে যার জন্য বিলিরুবিনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে জন্ডিস হচ্ছে। বাস্তব কিন্তু তা বলে না। তাই যে সাধারণ কারণটি পড়ে থাকে তা হল ভাইরাস। এখন এই ভাইরাস বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের কাছে পৌঁছবে কিভাবে? পৌঁছতে পারবে তখনই যখন সেখানে একটি সাধারণ মাধ্যম থাকবে। পাশাপাশি এটা খুব উল্লেখযোগ্য যে হেপাটাইটিস - ই ভাইরাস দ্বারা যদি কোনো অন্তসত্ত্বা মহিলা আক্রান্ত হন, তাহলে তার প্রভাব খুব মারাত্মক হতে পারে যতটা না ক্ষতি একজন সাধারণ মেয়ের হবে। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসাবে আমরা প্রয়াত পিয়ালী দেবীর মর্মান্তিক ঘটনাটিকেই রাখতে পারি।

বিজ্ঞান মনস্কর কাছে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুমানই কোন সিদ্ধান্ত টানতে পারে না, যতক্ষণ না উপযুক্ত তথ্যভিত্তিক নমুনা পাওয়া যায়। তাই জল থেকে স্থানীয় অঞ্চলে জন্ডিস ছড়িয়েছে এটা প্রতিষ্ঠা করার আগে কোনো জায়গায় কর্পোরেশনের জলের পাইপ ফেটেছে কিনা এবং ভাইরাস সংক্রমণটা সেই জন্যই হয়েছে কিনা তা জানা আবশ্যক ছিল। পাশাপাশি আরেকটি ব্যাপার আমরা খেয়াল করছিলাম। আমরা প্রশ্নপত্রটি তৈরী করেছিলাম সমীক্ষা শুরু করবার আগেই, কিন্তু সমীক্ষা চালাতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে জন্ডিসের মতো রোগকে ব্যক্তিগতভাবে যখন মানুষ প্রতিরোধ করে তখন তা অনেকটাই তার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন ধরুন যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তাঁরা তাঁদের ভাবনা অনুযায়ী ফিল্টার, অ্যাকোয়াগার্ড কিনে নিয়েছেন এবং ভালো হাসপাতালে প্রাইভেটে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। পাশাপাশি খালপাড়ের ঐ বস্তি অঞ্চলের অসহায় মানুষগুলো সবকিছু জেনেশুনেও জলটা পর্যন্ত ফুটিয়ে খেতে পারেনি অর্থাভাবে। সীমিত কেরোসিন, বাকিটা ব্ল্যাক-এ কিনতে হয়। তার পাশাপাশি তাদের পয়সা নেই। তাই তারা আমাদেরকে সেই প্রসঙ্গে বলেছিল – 'কেরোসিন দিয়ে ভাত ফুটিয়ে খাব, না জল?' এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর আমাদের কাছে ছিল না, তবে আমাদের প্রশ্নপত্রের কিছুটা অদলবদল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম সেদিন।

পরের দিন আমরা এই জন্ডিসের কারণ যে অশুদ্ধ কর্পোরেশনের জলই, তার রহস্য সন্ধানে দাগার মাঠের দিকে এগোলাম। এলাকায় পৌঁছে কোথা থেকে শুরু করব এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে সামনে দেখা গেল একটা মুদী দোকান। দোকানে গিয়ে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হল। তিনি জানালেন তাঁর নাম শঙ্কর ব্যানার্জি। উনি বললেন ওনার বাড়িতে ওনার নিজের, ভাইজির এবং নাতির এই তিনজনেরই জন্ডিস হয়েছিল। ওনারা কর্পোরেশনের জলই পান করতেন, কিন্তু মাঝে জল ঘোলা হয়ে যাচ্ছে দেখে বন্ধ করে দেন। বাড়িতে ওয়াটার পিউরিফায়ার কিনেছেন কিনা জানতে চাওয়ায় উনি সরাসরি জবাব দিলেন, 'না আমি কিনিনি, কারণ আমি এই জলই খাব এবং জল পরিস্কার না এলে প্রতিবাদও করব। আমি বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত, তাই আমি এব্যাপারে কর্পোরেশনের কাছে গিয়েছিলাম। প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও তাই করব।' আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও তো ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পর এখনও টাইমকলের জলে নাকি কেঁচো, জোঁক, নোংরা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।' উনি কথা থামিয়েই বললেন, 'পুরো সিস্টেমটাই এখন ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষ যতদিন না সচেতন হবে, প্রতিবাদ জানাবে যৌথভাবে, ততদিন কিছু ফল পাওয়া যাবে না।' আমরা বললাম, 'কিভাবে এল এত নোংরা, কেঁচো, জোঁক পানীয় জলে? আপনিই তো বললেন আগে স্বচ্ছ, পরিস্কার জল আসত। তা জলটা দূষিত হল কিভাবে?' শঙ্করবাবু উত্তর দিলেন, '১২২ এবং ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থল ঈশান ঘোষ রোডের কাছে জলের পাইপ ফেটে নোংরা জল ঢুকে জন্ডিস হয়েছিল।' আমরা বুঝলাম আমাদের অনুমান সঠিক ছিল। ঈশান ঘোষ রোড যাব কিভাবে বলায় উনি উৎসাহের সাথে তা বেরিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন। আমরা ওনাকে শেষ প্রশ্ন করলাম, 'জলের এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি?' কিছুটা চিন্তামগ্নভাবে শঙ্করবাবু বললেন, 'জল পরিশুদ্ধ হতে হবে, সেটাই তো হচ্ছে না। জলের উৎসস্থলের পরিচর্যা প্রয়োজন। তাছাড়া জলের পাইপের রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষভাবে দরকার। পাইপ ফেটে জলে নোংরা ঢুকে যাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না।' আসবার সময় আমাদের এই বিষয় নিয়ে এই ধরনের সমীক্ষাকে উনি অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আপনাদের এই সাংগঠনিক উদ্যোগে আমার কোনো সাহায্য লাগলে বলবেন।' আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তার সাথে বললাম যে বিজ্ঞানমনস্ক এবিষয়ে ভবিষ্যতে

স্থানীয় মানুষের মনের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করবে, তাতে ওনার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে কাম্য।

ঈশান ঘোষ রোড ঐ এলাকা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাই আমরা ঠিক করলাম তা পরের দিনের সমীক্ষার জন্যই রাখা যাক। আপাতত এই এলাকারই অন্যান্য পরিবারগুলোর কাছে যাওয়া যাক। শঙ্কর ব্যানার্জির কথা থেকে পানীয় জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার ঘটনা শুনলেও আমাদের মনে একটা প্রশ্ন ছিল। এলাকায় এত বড় ঘটনা কর্পোরেশনের গাফিলতির জন্য ঘটে গেল, কেউ কোনো যৌথ উদ্যোগ রাখল না? এর প্রতিকারের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না!

পরের বাড়িতে পৌঁছে আমরা অন্যান্য প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিলাম। ভদ্রলোকের নাম অসীত পাল। উনি সার্বিকভাবে যা বললেন তা হল এই – 'এগুলো তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ব্যাপার। আমাদের সংবিধানের খাঁচা যদি না পাল্টায় তাহলে ঐ পদে যে-ই যাবে একই ফল হবে। কোথাও কোনো গণ আন্দোলন নেই। পাঁচজন, দশজন এক হয়ে গণ আন্দোলনের পথে না যাওয়া পর্যন্ত রাস্তা নেই।' এরপর আর কিছু বলার থাকে না। তবে টাইম কলের জলের পাশাপাশি উনি টিউবওয়েলের জল সম্পর্কিত দুচার কথা বলেন – 'টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক আছে, তাও খাই। এখানে সব টিউবওয়েলেই একই সমস্যা'। জানা গেল স্থানীয় মানুষের এক অদ্ভুত অবস্থা। এক তো টাইম কলের নোংরা জল যা পানের অযোগ্য, দ্বিতীয়ত, টিউব ওয়েলের জলে আয়রন ও আর্সেনিকের সমস্যা। যেন জাঁতাকলের মাঝে রেখে তাঁদেরকে পেষণ করা হচ্ছে।

পরের দিন সমীক্ষা আমরা শুরু করলাম ঈশান ঘোষ রোডের ১২২ ও ১২৩ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থল থেকে। সামনেই চোখে পড়ল 'জাগরণী ক্লাব'। প্রায় প্রতিটি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করায় আরো নতুন কিছু তথ্য বেরিয়ে এল। ঈশান ঘোষ রোডের এক প্রান্তে হার্ড মেটালের সামনে কর্পোরেশনের জলের পাইপ ফেটে যায়। পাশেই ছিল নর্দমার নোংরা জলের লাইন। ভালোভাবে দুইয়ে মিলেমিশে গিয়ে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। কর্পোরেশনেরও নজরে পড়ে না এবং সেই জল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হলে স্বাস্থ্য দপ্তরেরও টিকির দেখা মেলে না। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তর হল সরকারের সেই সংস্থা যারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে রোগ হবার আগে ও পরে মানুষকে সচেতন করে তাকে মোকাবিলা করার জন্য। আমরা পরিবারগুলোকে জিজ্ঞাসা করি যে কর্পোরেশনের পরবর্তীকালে কোনো ভূমিকা ছিল কিনা। তাঁরা জানান যে এলাকার ঘরে ঘরে যখন জন্ডিস হচ্ছিল তখন ওনাদের মধ্যে কেউ কেউ টিভি চ্যানেলকে খবর দেন। দুএকটি টিভি চ্যানেল আসেও এবং তাদের চ্যানেলে স্থানীয় অঞ্চলের ঘটনা দেখানোও হয়। মিডিয়ার এই প্রচারে সব নড়ে চড়ে বসে। তাছাড়া জনগণ স্থানীয় ক্লাব জাগরণীর মাধ্যমে একটি চিকিৎসা ক্যাম্প বসায়। সেই ক্যাম্পে ডাক্তার বসানো হয়, প্রয়োজনীয় ওষুধও সরবরাহ করা হয়। এত সব চাপ খেয়ে কর্পোরেশন সবশেষে এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় দুবেলা পানীয় জলের গাড়ি এনে জল সরবরাহ করে। এবং ঘরে ঘরে গিয়ে ও আর এস, আয়রন ট্যাবলেট ইত্যাদি বিতরণ করে। কিন্তু সদিচ্ছা না থাকলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। হার্ড মেটালের কাছে বস্তি অঞ্চলে যে ছটি পরিবার বাস করেন তাঁরা আমাদের অতি দুঃখের সাথে জানিয়েছেন, 'আমরা বস্তিতে থাকি বলে, জলের গাড়ি আমাদের এখানে দাঁড়াতো না। জল আনতে আমাদের অনেকটা দূর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হতো। ওরা গাড়ি দাঁড় করাতো ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে।' এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ঐ এক কামরার ছ-ছটি পরিবারের মধ্যেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এই জন্ডিসের প্রকোপে। যারা মারা গেছেন তাঁদের মধ্যে একটি ছেলের বয়স ২২ বছর। অপরজন ১৭ বছরের এক বিবাহিত মহিলা এবং যাঁর ঠিক দেড় বছরের একটি দুধের শিশু রয়েছে। মা হারা সন্তানটি আজ এতটাই ছোট যে সে তার জীবনের এই করুণ পরিণতির জন্য কাউকে দায়ী পর্যন্ত করতে পারে না।

ঐ অঞ্চলে শুধু দুটি প্রাণ হানিই ঘটেনি। পুরো এলাকায় মৃতের সংখ্যা আরো বেশী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে একজোট করে আমরা বিজ্ঞানমনস্কর তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'কিভাবে আপনারা পানীয় জলকে শুদ্ধ করতে চান, কি প্রস্তাব আছে এ ব্যাপারে আপনাদের?' তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এসে আমাদের জানিয়েছেন যে ওনারা প্রতি দুমাস অন্তর পানীয় জলের নমুনা নিয়ে কর্পোরেশনকে পরীক্ষা করতে দেবেন। প্রয়োজন হলে দুজায়গা থেকে এই পরীক্ষা করা দরকার যাতে এক জায়গার রিপোর্ট ভুল এলেও অন্য জায়গার রিপোর্ট ঠিক থাকে। আমাদের কাছে আরো

প্রস্তাব এসেছে যে, 'আপনারা বিজ্ঞান সংগঠন হিসাবে এই রোগটির ব্যাপারে আমাদের জানান এবং জনসচেতনমূলক অনুষ্ঠান নিন।' আমাদের কাছে দুটি মতই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। স্থানীয় অঞ্চলে যাদের একাজ করা দরকার তাদের অর্থাৎ স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো ভূমিকা না থাকায় আজ এই দাবী ওঠা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমাদের এই দীর্ঘ প্রায় একমাস ব্যাপী সমীক্ষা হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যেত যদি না তার শেষটি এমনভাবে হত।

সমীক্ষা চালাতে চালাতে আমরা সর্বশেষ পর্যায়ে একটি বাড়িতে পৌঁছাই। যৌথ পরিবার। তার মধ্যে যিনি আমাদের সাথে কথা বলতে এগিয়ে আসেন, কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি উনি হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট বা স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন প্রাক্তন কর্মী। আমরা এই সমীক্ষা চালানোর জন্য যে প্রশ্নপত্রটি পরের বার তৈরী করেছিলাম, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, 'এই এলাকায় জন্ডিস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের কি ভূমিকা ছিল?' আমরা এই প্রশ্নটা ওনার কাছে রাখতে উনি কিছুক্ষণ থেমে তারপর বললেন, 'দেখ বাবা, আমি নিজে দীর্ঘবছর ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করেছি। আমি নিজে মানুষকে বুঝিয়েছি জন্ডিস না হবার জন্য কি কি করা উচিত। কিন্তু যখন আমার নিজের জন্ডিস হল তখন আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে আমাকে এই রোগ কাবু করল কিভাবে!' আমরা ওনার সাথে কথা বলে জানলাম যে উনি জীবনে কোনোদিনও বাড়ির বাইরে জল খাননি, ঠান্ডা পানীয়ও খাননি। খেলে খেয়েছেন গরম চা যা জল ফুটিয়েই বানানো এবং মিষ্টির দোকানের ঠান্ডা দই। এহেন একজন সচেতন মানুষের নিজেরই জন্ডিস হওয়ায় উনি হতবাক। উনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেছেন, 'যখন প্রথম আমার চোখের নীচে হলুদ হয়, আমি পরীক্ষা করালাম এবং জানতে পারলাম আমার শরীরে বিলিরুবিনের পরিমাণ সামান্য বেড়েছে। আমি পাত্তা দিইনি, কারণ বিভিন্ন কারণে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়তে পারে। কিন্তু যখন পরীক্ষা করে জানা গেল আমার জন্ডিসই হয়েছে, তখন তা কিভাবে হল তার কারণ খুঁজতে চেষ্টা করলাম। কিছুদিন বাদে আমার বাড়ির আরো দুএকজনের জন্ডিস হল। তখনও আমার মাথায় আসেনি যে জল থেকেই এই জন্ডিস ছড়িয়েছে। কিন্তু যখনই দেখলাম যে পাড়ার বহু মানুষেরই তা হচ্ছে, তখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে নিশ্চয়ই কোনো কমন ফ্যাক্টর রয়েছে। আর সেইটা জল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। পরে জলের পাইপ ফেটে যাবার ঘটনা শুনলাম।'

ভদ্রলোক আমাদের বলছিলেন তাঁর কর্মজীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা। স্বাস্থ্য দপ্তরে দুধরনের ডিপার্টমেন্ট থাকে – প্রিভেন্টিভ অর্থাৎ রোগ হওয়ার আগেই এলাকায় গিয়ে গিয়ে মানুষকে বোঝানো যে কী কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিলে আর তা হবে না এবং কিওরেটিভ অর্থাৎ রোগ হয়ে গেলে সেরে ওঠার রাস্তা বাতলানো। উনি ছিলেন প্রিভেন্টিভ ডিপার্টমেন্ট-এ। বহু জায়গায় তিনি গিয়ে দেখেছেন যে সেই অঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহ ভালো না থাকায় অনেক মানুষই বাধ্য হয়ে পুকুরের নোংরা জল পান করেন। উনি বলেন, 'যদি আমি তাঁদের গিয়ে সরাসরি বলি যে পুকুরের জল না খেতে, তাঁরা আমাকে ফিরে বলবে বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে। তাই আমরা তাঁদের গিয়ে বলতাম যে পুকুরের জল খেলে তা ফুটিয়ে খাবেন।' স্থানীয় অঞ্চলের ঘটনার উদাহরণ টেনে আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ঘটনাই তো দেখিয়ে দিল যে মানুষ যতই সচেতন হোন, যারা সরবরাহের দায়িত্বে আছে তারাই যদি বিশুদ্ধ জল সরবরাহ না করে তো সাধারণ মানুষের পক্ষে কি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এর স্থায়ী সমাধান করা আদৌ সম্ভব ছিল?' উনি নিজে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী হয়েও আমাদের বক্তব্যে সহমত পোষণ করলেন। ওনার সততা আমাদের উৎসাহিত করল। উনি স্বীকার করলেন, 'সরকারী ব্যবস্থা ঠিক না হলে আমাদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। তাছাড়া আজ আমাদের দেশে জন্ডিস ছড়ানো হচ্ছে, বিদেশে এড্‌স ছড়ানো হয়। উদ্দেশ্য একটাই। ওষুধের বাজার বৃদ্ধি করা। মানুষ বড় জোর সচেতন হয়ে সরকারের কাছে দাবী করতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক না হলে রোগ প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধান পাওয়া অসম্ভব।'

ওনার সাথে এই দীর্ঘ আলাপচারিতা থেকে আমরা শিখলাম জনগণকে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবী তোলা আবার তখনই সম্ভব হবে যখন জন্ডিস কি, কেন হয়, হলে কি কি করা উচিত এবং জল থেকেই বা কিভাবে জন্ডিস ছড়ায় – এ সমস্ত সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করা যাবে। ■

জন্ডিস নিয়ে জনৈক ডাক্তারের সাথে কথোপকথন

[জন্ডিস বিষয়ে, সমীক্ষা চালাতে গিয়ে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো উঠে আসে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে সেগুলোকে মাথায় রেখেই সমস্যার সমাধানার্থে ডা: এম কে রায়-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক]

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ আমরা এসেছি "বিজ্ঞান মনস্ক" নামে একটি বিজ্ঞান সংগঠন থেকে। কয়েকমাস আগে আমাদের কাছে খবর আসে খালপাড় অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষের জন্ডিস হচ্ছে। এ খবর পেয়ে আমরা যাই সমীক্ষা করতে। দেখি ব্যাপক হারে জন্ডিস ছড়িয়ে পড়েছে। মহামারীর রূপ নিয়েছে। কেউ কেউ মারাও গেছে।

ডাক্তার ঃ ব্যাপক হারে মানে? কত পারসেন্ট?

বি. ম. ঃ খালপাড় অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক ঘরে জন্ডিস হয়েছে। ঈশান ঘোষ রোডের কাছে আরও মারাত্মক আকারে ছড়িয়েছে। ওখানে জলের পাইপ ফেটে গিয়েছিলো।

ডা. ঃ জলের পাইপ তো আমাদের এই রাস্তার কাছে বেশিরভাগ সময়ই ফাটা থাকে।

বি. ম. ঃ ওখান থেকে কন্টামিনেশন হয়েছে এবং আন্দাজ করা যায় ঐ জল থেকে জন্ডিস ছড়িয়েছে। স্থানীয় লোকজন জলে কেঁচো, গেড়ি, নোংরা ইত্যাদি পেয়েছে।

মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে জন্ডিস সম্পর্কে বহু টেকনিক্যাল প্রশ্ন এসেছে। যেগুলো আগে জানা ছিলো না। সার্ভে করে কোনও ঘটনাকে তুলে আনব – এটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঐ এফিসিয়েন্সি আমাদের ছিল না বলে একজন ডাক্তারের মতামত জানা দরকার হয়ে পড়ে। এ জায়গা থেকে আপনার কাছে আসা।

ডা. ঃ কি জানতে চাও?

বি. ম. ঃ জন্ডিস কি ব্যাপার এবং কিভাবে এটা হয়? এ ব্যাপারে যদি একটু বলেন।

ডা. ঃ আগে জানতে হবে জন্ডিসের ডেফিনিশন কী? রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ যদি নর্মালের থেকে বেড়ে যায় তাহলে জন্ডিস হয়। জন্ডিস তিন রকমের হয়। হিমোলিটিক জন্ডিস, ইনফেকটিভ জন্ডিস আর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস।

বি. ম. ঃ সহজ করে বলা যাবে – সাধারণ মানুষের জন্য?

ডা. ঃ অতিরিক্ত লোহিত কণিকা ভেঙ্গে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে হিমোলিটিক জন্ডিস হয়। লিভার ইনফেক্সন থেকে ইনফেকটিভ জন্ডিস এবং পিত্ত প্রবাহ পথে অবস্ট্রাকশন হয়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে তাকে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস বলে।

বি. ম. ঃ শরীরে বিলিরুবিন তৈরি হয় কিভাবে?

ডা. ঃ লিভার তৈরি করে। মেটাবলিক পাথে। এর মেকানিজম মনে হয় সাধারণ মানুষের জানা দরকার নেই।

বি. ম. ঃ জন্ডিস সংক্রামকগুলি কী কী হতে পারে?

ডা. ঃ জল থেকে হতে পারে। হেপাটাইটিস বি, সি রক্তবাহিত হয়। হেপাটাইটিস–এ মেইনলি হয় ওরোফিক্যাল রুটে। কারো শরীরে যদি এইচ এ ভি (হেপাটাইটিস–এ ভাইরাস) থাকে, তার পায়খানা দিয়ে বেড়িয়ে যদি তা কোনোভাবে আর একজনের মুখের মধ্য দিয়ে ঢোকে সেভাবে সংক্রামিত হয়। কমনলি জল থেকে ঢোকে।

বি. ম. ঃ সমীক্ষায় জানা গেছে অনেকের হেপাটাইটিস–এ আর ই হয়েছে।

ডা. ঃ এ দুটিই ওরাল রুটে হয়।

বি. ম. ঃ জল থেকে?

ডা. ঃ জল বলে না। ওরাল রুটে হয়। মুখ দিয়ে প্রধানত জলের সঙ্গে, খাবারের সঙ্গে, কাটা ফলের সঙ্গে ঢুকতে পারে।

বি. ম. ঃ আমরা যে জল পান করি, তা পাকস্থলিতে যায়। ঐ জলে ভাইরাস থাকলে তা কিভাবে আমাদের লিভারকে আক্রমণ করে?

ডা. ঃ ইনটেনস্টাইনস-এ অ্যাবজরব্ড হয়ে ব্লাডে যায়। ব্লাড থেকে লিভারে যায়।

বি. ম. ঃ ভাইরাস যখন কারো লিভার আক্রমণ করে তার কত পরে জন্ডিসের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, যেমন শরীরের বিভিন্ন অংশ হলুদ হয়ে যাওয়া ... ইত্যাদি?

ডা. ঃ ইনকিউবেশন পিরিয়ড-এ। তবে ডিটেইলসে বলতে গেলে বইপত্র দেখে বলতে হবে। এই মুহূর্তে ...। তবে সাধারণত তিন সপ্তাহ পর থেকে।

বি. ম. ঃ তাহলে এর আগে আর বোঝার উপায় নেই? গায়ে-গায়ে জ্বর, ক্লান্তিভাব – এগুলি কি আগেই শুরু হয়ে যায়?

ডা. ঃ এগুলি সাইমালট্যানিয়াসলি হয়। জ্বর হওয়ার সাত দিনের মধ্যে জন্ডিস দেখা দেয়।

বি. ম. ঃ ইনফেকশন শুরু হয়ে যায় আগে থেকেই?

ডা. ঃ হয়। ঐ পক্সের মত।

বি. ম. ঃ আর নিউ বর্ন বেবিদের ক্ষেত্রে যে জন্ডিস হয়?

ডা. ঃ অধিকমাত্রা আর বি সি প্রিম্যাচুওর ভেঙ্গে গিয়ে হতে পারে, ব্রেস্ট মিল্ক থেকে হতে পারে। আবার লিভার ইমম্যাচুরিটির জন্যও হয়। সেজন্য কম ওজনের বাচ্চাদের এটা বেশি হয়।

বি. ম. ঃ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা তাহলে ভাইরাল নয়। কিন্তু হেপাটাইটিস–এ ও ই এই জল বাহিত ভাইরাস দুটির কথা যে বললেন, জল বয়েল করলে কি এরা মরে যাবে?

ডা. ঃ বয়েল করলে তো মরে যাবে। তবে জল ফুটন্ত অবস্থায় কুড়ি মিনিট ফোটাতে হবে। একনাগারে।

বি. ম. ঃ জন্ডিসের যেকোন ধরনের হেপাটাইটিসের ভ্যাকসিনেশন হয় কি? একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম – চীনে ওরা নাকি দাবি করছে যে, হেপাটাইটিস ই-এর ভ্যাকসিন ওরা আবিষ্কার করেছে। এটা তথ্য জাস্ট। এর সত্যমিথ্যা জানা নেই। হেপাটাইটিসের কোন ভ্যাকসিনেশন হয়?

ডা. ঃ বি এবং এ-এর ভ্যাকসিনেশন তো আছেই।

বি. ম. ঃ সেটা প্রিভেনটিভ কিনা ...।

ডা. ঃ ভ্যাকসিনেশন তো প্রিভেনটিভ বলা হয়। তবে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন সবার নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে যেমন সবাইকে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে তার প্রয়োজন নেই। রক্ত ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যারা ঘাটাঘাটি করবে বা যাদের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা, যেমন নার্সিং স্টাফ, মেডিক্যাল স্টাফ – এদের নেওয়া প্রয়োজন। একদম আমজনতার নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

বি. ম. ঃ কিভাবে এটা ছড়ায়?

ডা. ঃ ঐ যে বললাম রক্তের মাধ্যমে। ইনজেকশন সিরিঞ্জের যদি প্রপার স্টেরিলাইজেশন না হয়।

বি. ম. ঃ ভ্যাকসিনেশন ছাড়া অন্য কোন ড্রাগ কি আছে যা জন্ডিস প্রতিরোধ করতে পারে? যেমন রেগুলার ইনজেকশন অফ ইমিউন সীরাম গ্লোবিউলিন।

ডা. ঃ না। তবে ভাইরাসের ইনফেকশন প্রতিরোধে ইমিউনিটি থাকা খুব প্রয়োজন।

বি. ম. ঃ ক্রনিক জন্ডিস কি ভাইরাস থেকে হতে পারে?

ডা. ঃ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

বি. ম. ঃ সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা কি?

ডা. ঃ নিউট্রিসাস্ ডায়েট আর ঐ ভাইরাস মারার জন্য ওষুধ খাওয়া। ক্রনিক হেপাটাইটিস হয় সাধারণত এইচ বি ভি (হেপাটাইটিস–বি ভাইরাস) থেকে। তা থেকে ক্যানসার এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বি. ম. ঃ তাহলে কোন ক্ষেত্রে ক্রনিক হবে বা হবে না, কিভাবে বোঝা যাবে?

ডা. ঃ সব থেকে বেশি নির্ভর করে বডির প্রোটেকশন পাওয়ারের উপর। নিউট্রিশন। নিউট্রিশন থেকে ইমিউনিটি।

বি. ম. ঃ সমীক্ষার সময় যেসব মর্মান্তিক পরিস্থিতি ফেস করি – তার একটা বলি। ২১ বছরের এক সদ্য বিবাহিত যুবক, সাথে বাবা মা তিনজনেই জন্ডিস আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। বাবা, মা বেঁচে যান। তাদের ছিলো হেপাটাইটিস ই কিন্তু যুবকটি ভর্তির একদিন পরেই কোমায় চলে যায় এবং মারা যায়। এটাও কি তাহলে তার শরীরে কম ইমিউনিটির জন্য?

ডা. ঃ এটা ভাইরাল। এক্ষেত্রে ভাইরাসের লোড অনেক বেশি ছিলো অর্থাৎ বেশি সংখ্যক ভাইরাস একসঙ্গে আক্রমণ করে এবং তার ইমিউনিটি হয় কম ছিলো।

বি. ম. ঃ বিভিন্ন যে লিভার টনিক; ডাক্তাররা যেটা প্রেসক্রাইব করেন ...

ডা. ঃ কোন কাজ করে না; তা সবাই জানে। তাও করে। ওগুলি খাওয়ার কোন দরকার হয় না। নিউট্রিসাস ডায়েট ও রেসট্রিকটেড লাইফ লিড করলেই সুস্থ থাকা যায়। রেস্ট নিতে হবে। মেইনলি রেস্ট নেওয়া।

বি. ম. ঃ তাহলে জন্ডিস হলে ডাক্তার দেখানো উচিত, না নিজেরা নিউট্রিসাস খাবার, প্রচুর জল ও সঠিক রেস্ট নিলেই হবে?

ডা. ঃ ডাক্তার তো দেখাতেই হবে। কি টাইপের জন্ডিস হয়েছে, কেন হয়েছে তা বোঝার প্রয়োজন আছে।

বি. ম. ঃ একজন ডাক্তার জন্ডিসের জন্য কি ধরনের টেস্ট করান?

ডা. ঃ বিলিরুবিন, ইউরোবিলিনোজেন, ইমিউনিটি অর্থাৎ ইমিউনোগ্লোবিন কেমন আছে?

বি. ম. ঃ এটা কেন করান?

ডা. ঃ কোন ধরনের ভাইরাস, হেপাটাইটিস–এ না বি না অন্য কি – দেখার জন্য।

বি. ম. ঃ এস জি পি টি টেস্ট কি জন্ডিস হলে করানো হয়?

ডা. ঃ এটা থেকে লিভারের ফাংশন বোঝা যায়। বোঝা যায় – লিভার কতটা ড্যামেজ হল বা না হল।

বি. ম. ঃ জন্ডিস পুরোপুরি সেরে গেছে কিনা, তা হেপাটাইটিস যদি হয়; তা বিলিরুবিন টেস্ট করলেই বোঝা যায়?

ডা. ঃ না। বিলিরুবিন নর্মাল হয়ে গেলে সাধারণত ধরা হয় কিয়োর্ড হয়েছ তুমি, কিন্তু তাহলেও পুরোটা সেরে গেছে কিনা সেজন্যই তো এন্টিবডি ক্রাইটেরিয়াগুলি দেখতে হয়।

বি. ম. ঃ আমরা জেনেছি ওখানে (ঈশান ঘোষ রোড) একটা

ক্যাম্প করা হয়েছিল এবং ও আর এস ও আয়রন ট্যাবলেট বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

ডা. ঃ এর সাথে জন্ডিসের সম্পর্ক নেই।

বি. ম. ঃ তাহলে এর পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

ডা. ঃ সেটা তোমরা ঠিক করবে। আমার কোন উদ্দেশ্য জানার প্রয়োজন নেই। আপামর জনসাধারণ যারা আছে তারা ঠিক করবে উদ্দেশ্য কি আছে। স্বাস্থ্য আন্দোলন করতে চাইছ তো তোমরা?

বি. ম. ঃ নিশ্চয়ই। মানুষ প্রস্তুত থাকলে।

ডা. ঃ মানুষ প্রস্তুত থাকে না। মানুষকে প্রস্তুত করতে হয়।

বি. ম. ঃ মানুষের যদি ধরুন ...

ডা. ঃ মানুষ প্রস্তুত থাকে না (জোরের সাথে)। মানুষ প্রস্তুত থাকলে তোমাদের দরকার নেই। মানুষই করে নেবে।

বি. ম. ঃ চাহিদা তো থাকতে হবে?

ডা. ঃ চাহিদা তো আছে। সব আছে। মিশন তোমাকেই দেখাতে হবে।

বি. ম. ঃ আর মেক্যিাল ক্যাম্প যে বসে ...

ডা. ঃ মেডিক্যাল ক্যাম্প! আর কি বলব। ওগুলো প্রলেপ দেওয়া, মলম লাগানো। আর কিছু নয়।

বি. ম. ঃ গণচেতনা বৃদ্ধি তো করবই। কিন্তু ঐ মানুষগুলোর ট্রিটমেন্টটা কি করে হবে, যাদের হাতে পয়সা নেই? ওখানে অনেক বস্তি অঞ্চল আছে। সেখানে অনেক মানুষ মরে গেছে। তখন যদি আমরা যেতাম। খবর পাইনি আগে। তাহলে তাদের তো একটা ইমিডিয়েট সমাধান দিতে হত।

ডা. ঃ চিকিৎসা করাতে হবে।

বি. ম. ঃ তাবলে তাদের যদি আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকে; মেডিক্যাল ক্যাম্পটাকে কেন বিরোধিতা করব?

ডা. ঃ মেডিক্যাল ক্যাম্প দিয়ে তো সমস্যার সমাধান হবে না। মেডিক্যাল ক্যাম্প করলে কি জন্ডিস হবে না?

বি. ম. ঃ তাহলে বিরোধিতা করব?

ডা. ঃ না, বিরোধিতা কেন করবে? এই মুহূর্তে যতটুকু দরকার ততটুকু তো দিতে হবে। কিন্তু স্থায়ী সমাধানটাই তো দরকার।

বি. ম. ঃ কেউ প্রাইভেট উদ্যোগে ভ্যাকসিন নিচ্ছে, কেউ নিচ্ছে মেডিক্যাল ক্যাম্প থেকে। সেক্ষেত্রে কি কোন ফারাক আছে?

ডা. ঃ খারাপ হওয়ার কথা নয়। যারা মেডিক্যাল ক্যাম্প করছে তারা যদি অনেস্ট হয়, খারাপ হবে কেন?

বি. ম. ঃ একটা ভায়েল না কি বলে, সেখান থেকে কি অনেককে দেওয়া ঠিক হয়?

ডা. ঃ একটা ভায়েল দশটা করে ডোজ থাকে। সিঙ্গল ডোজ থাকে না। সিঙ্গল ডোজ পাওয়া যায় বাজারে। দাম বেশি হয়।

বি. ম. ঃ দশটা ডোজ দেওয়ার সময় কম-বেশি হয়ে যেতে পারে না?

ডা. ঃ মেপে দিলে কম-বেশি হবে কেন? দশটা থেকে যদি পনেরটা করে, তাহলে কম-বেশি হবে।

বি. ম. ঃ এবার আমরা একটু বিশ্লেষণধর্মী জায়গা থেকে এভাবে যদি ভাবি যে, একটা বিস্তীর্ন অঞ্চলে জন্ডিস হচ্ছে ...

ডা. ঃ বিস্তীর্ন অঞ্চলে যদি জন্ডিস হয় তাহলে একটা কমন সোর্স থেকেই আসছে।

বি. ম. ঃ কমন সোর্স কি হতে পারে? আপনার ধারনা ...

ডা. ঃ কমন সোর্স তো জলই হতে পারে। এছাড়া আর কি হতে পারে?

বি. ম. ঃ এবং পাইপ ফেটেছিল, জল দূষিত হয়েছিলো ...

ডা. ঃ সবই হল – পাইপ ফেটেছে, জলে নোংরা পাওয়া গেছে। জন্ডিস হয়েছে – সবই ঘটনা। তোমাকে এখানে প্রমাণ করতে হবে জলটার মধ্যে ভাইরাস আছে কিনা। তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

বি. ম. ঃ আচ্ছা, সাধারণ মানুষকে কি বলা যায় – এটা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে?

ডা. ঃ সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ করবে বলতে – যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে পারে; যারা জল সাপ্লাই করছে তাদের প্রেসারাইজ করা।

বি. ম. ঃ মানে কর্পোরেশন?

ডা. ঃ হ্যাঁ তাই।

বি. ম. ঃ এখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের কি ভূমিকা থাকলে ভাল হয়? স্বাস্থ্য দপ্তর তো প্রচার করে, বিভিন্ন অঞ্চলে যায়। প্রিভেনটিভ ও কিওরেটিভ দুটো ডিপার্টমেন্টও আছে।

ডা. ঃ স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে ডিম্যান্ড করতে হবে পরিশ্রুত জল সাপ্লাই করার জন্য।

বি. ম. ঃ ওয়াটার পিউরিফিকেশনের কথা বললেন ...

ডা. ঃ পিউরিফিকেশন নয়। পরিশ্রুত জল। পিউরিফিকেশন ও পরিশ্রুত জলের মধ্যে পার্থক্য আছে।

বি. ম. ঃ পরিশ্রুত জল বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন?

ডা. ঃ যেটা পানের উপযুক্ত; স্বাস্থ্যকর।

বি. ম. ঃ কর্পোরেশন যে জলটা পাঠায় সেটা পরিশ্রুত হওয়া দরকার না ঘরে যে জলটা এলো সেটাকে আবার ...

ডা. ঃ ওরা যদি অপরিশ্রুত জল পাঠায়, ঘরের মধ্যে পরিশ্রুত জল আসবে কোথা থেকে?

বি. ম. ঃ বাড়িতে বাড়িতে আমরা জেনেছি জন্ডিসের পর –

অ্যাকোয়া ফিল্টার ব্যবহার করছে।

ডা. ঃ ফিল্টার দিয়ে ভাইরাস আটকায় না।

বি. ম. ঃ কারণটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

ডা. ঃ এটা সায়েন্সের ব্যাপার। ফিল্টার দিয়ে ভাইরাস আটকানো যায় না। অ্যাকোয়াগার্ড দিয়ে ভাইরাস মারা যায় না। এটাই আসল কথা। অ্যাকোয়াগার্ডে ভাইরাস মারার মেকানিজম নেই।

বি. ম. ঃ আলট্রা ভায়োলেট রে ...

ডা. ঃ ওটার মেকানিজম জানতে হলে – যে জলটা বেড়িয়ে আসে তা কতক্ষণ আলট্রা ভায়োলেট রে-র এগেইনস্ট-এ থাকে; মানুষকে তা বোঝাতে হবে।

বি. ম. ঃ হেপাটাইটিস–এ ও ই ভাইরাস যেহেতু জলবাহিত, জলের ট্রিটমেন্ট করলে এই ভাইরাস দুটি নির্মুল হতে পারে?

ডা. ঃ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে করা হয়।

বি. ম. ঃ এবার যদি বলি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং জল বন্টন ব্যবস্থা ...

ডা. ঃ সবকিছুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত। সব কিছু মানুষের জন্য করা হচ্ছে না; ব্যবসার জন্য করা হচ্ছে – এটাই আসল কথা। আর কিছুই না।

বি. ম. ঃ মানুষের দাবীগুলি থেকে যদি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি, একজনকে যাতে ভবিষ্যতে জন্ডিস আক্রমণ না করে বা মহামারির আকার না নেয়, সে জায়গা থেকে মানুষকে কি সাজেশন দেওয়াটা সায়েন্টিফিক?

ডা. ঃ পরিশ্রুত জল।

বি. ম. ঃ আপনি বললেন ফিল্টার, অ্যাকোয়ার্ডগার্ড এক্ষেত্রে কাজ করে না। আয়রন বা আর্সেনিক হয়ত দূর হতে পারে।

ডা. ঃ সাধারণ ফিল্টারে আর্সেনিক দূর হয় না। প্লেইন সেডিমেন্টগুলি অর্থাৎ জলে দ্রবীভূত মাটি দূর হয়।

বি. ম. ঃ তাহলে তো বাড়িতে ফিল্টারও কিনতে হবে না, যদি সাপ্লাই থেকে ভাল জল আসে।

ডা. ঃ নিশ্চয়ই।

বি. ম. ঃ তাহলে আপনার মতে ভ্যাকসিনেশন থেকেও মেইন হল ওয়াটার ডিসট্রিবিউশন সিস্টেম। এর দুটি পর্যায়। একটা হল প্লান্টে ধরুন জলটা পরিশ্রুত হল ...

ডা. ঃ সবটাই। দুটো কেন? একদম প্রোডাকশন থেকে কনজামশন পর্যন্ত। এইটা পুরো সাইন্টিফিক প্যাটার্ন।

বি. ম. ঃ এটাই একমাত্র পথ?

ডা. ঃ নিশ্চয়ই।

বি. ম. ঃ একজন স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। উনি ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী। ওনার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উনি বলেন যে ওখানকার অধিকাংশ নর্দমার লাইন ও জলের লাইন পাশাপাশি অবস্থান করে। ওখানে যে পাইপটা ফেটেছে সেটাতে নাকি প্রচুর ফাটল ধরেছে এবং সেগুলি জয়েন্ট করা হয়। এবং তার ফলে জলের চাপ কমে যায়। ঐ পাইপগুলির যে থিকনেস হওয়া উচিত, তা নেই; যে ম্যাটেরিয়ালের হওয়া উচিত তার থেকে বাজে ম্যাটেরিয়ালের। তার ফলে ফাটার সংখ্যা বেড়ে যায়, প্রচুর লিকেজ রয়েছে। এই যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে জন্ডিসের নিরিখে বা জলবাহিত যেকোন রোগের নিরিখে মানুষকে স্থায়ী ও বাস্তব সম্মত কি দাবীতে নিয়ে এগোলে মানুষ তার সমাধান পাবে?

ডা. ঃ প্রশ্নটা আমাকে করার কোন যুক্তি নেই।

বি. ম. ঃ আপনি তো একজন সচেতন মানুষ।

ডা. ঃ এটা তুমি যে কোন সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়ে দেবে।

বি. ম. ঃ আপনাকেও সে জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করছি।

ডা. ঃ তুমিইতো উত্তর দিতে পারবে। এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিশ্রুত জল আসে। এটাই সাধারণ উত্তর।

বি. ম. ঃ মানে নর্দমার সঙ্গে যে জলের পাইপের ...

ডা. ঃ নর্দমা পাশে করা হবে কি, আকাশে করা হবে কিংবা মাটির বহু নিচে করা হবে, সব কিছু নির্ভর করছে মানুষের প্রয়োজনের জন্য।

বি. ম. ঃ একটি তথ্য থেকে জানা যায় – পশ্চিমবঙ্গে মানুষের শতকরা ৭০ ভাগ রোগের কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব।

ডা. ঃ পশ্চিমবঙ্গেই শুধু না। সারা ভারতবর্ষেই তাই।

বি. ম. ঃ তাহলে সুস্থ্য জীবনধারণের জন্য পরিশ্রুত ও জীবাণুমুক্ত পানীয় জলের বিকল্প যেখানে নেই, তা থেকে কি করতে হবে?

ডা. ঃ উন্নতমানের পুরু পাইপ ব্যবহার করতে হবে। জীবনকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পাইপ পাল্টাতে হবে। পাইপ ফাটবে তারপর পাল্টাব; তাহলে তো চলবে না।

বি. ম. ঃ আপনার বাড়িতে কেমন জল পান?

ডা. ঃ মাঝে মাঝে ঘোলা আসে। তখন ওটা ফেলে দিতে হয়। চোখে দেখে যতটা ঠিক মনে হয়, এই আর কি।

বি. ম. ঃ আপনার বাড়িতে অ্যাকোয়াগার্ড আছে?

ডা. ঃ আছে একটা।

বি. ম. ঃ আপনি যে বললেন এতে কোন কাজ করে না।

ডা. ঃ করে না। কিন্তু পরিবারে তো অনেককে নিয়ে চলতে হয়। ■

জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিসের স্বরূপ ও প্রতিকার

"জন্ডিস" শব্দটি দ্বারা আমাদের শরীরের যে বিশেষ অবস্থাটা বোঝায় বহু প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মানুষ সেই বিশেষ শারীরিক অবস্থাটা বোঝাতে "ন্যাবা" শব্দটা ব্যবহার করত। জন্ডিস শব্দটা ফরাসী শব্দ JAUNE থেকে এসেছে, যার অর্থ হলুদ। জন্ডিস কোন রোগ নয়, বিভিন্ন রোগের বহিঃপ্রকাশ। যকৃৎ (Liver), পিত্তথলির (Gall Bladder) বিভিন্ন রোগ এবং লোহিত রক্তকণিকার বিশৃঙ্খল ভাঙ্গনের বহিঃপ্রকাশ হল জন্ডিস। প্রথমে চোখের সাদা অংশ, জীভের নিচের দিক এবং পরে হাত ও পা-এর পাতা সহ সারা শরীরের চামড়া হলুদ হয়ে যায়।

কিন্তু কেন এমনটা হয়?

আমাদের রক্তের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হল লোহিত রক্ত কণিকা যার আয়ুষ্কাল গড়ে ১২০ দিন। আমাদের শরীরের হাড়ের মজ্জা থেকে প্রতিনিয়ত অসংখ্য লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি হচ্ছে এবং গড় আয়ুষ্কাল পার হওয়া অসংখ্য লোহিত রক্ত কনিকা ধ্বংস হচ্ছে। এইভাবে জীবিত মানব দেহে লোহিত রক্ত কনিকার জন্ম-মৃত্যুর একটা ভারসাম্য বজায় থাকছে। লোহিত রক্ত কণিকার অন্তরবস্তু হল লৌহ ঘটিত প্রোটিন হিমোগ্লোবিন। ধ্বংস প্রাপ্ত লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে প্রথমে তৈরী হয় বিলিভার্ডিন যা পরবর্তীতে বিলিরুবিনে পরিণত হয় – যা রক্তের মাধ্যমে যকৃতে পৌছায়। যকৃতে বিলিরুবিনের কিছুটা অংশ আবার বিলিভার্ডিনে পরিণত হয়। বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন লিভারের কোষে থাকা উৎসেচকের সাহায্যে যৌগে পরিণত হয়। এই যৌগগুলি পিওরসের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালীর ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌছায় এবং আরও পরিবর্তিত হয়ে একটা অংশ মলের সহিত দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় এবং সামান্য পরিমাণ ইউরোবিলিনোজেন রূপে কিডনির (বৃক্ক) মাধ্যমে মূত্রের সাথে নিষ্কাশিত হয়। আবার লিভার থেকে সামান্য পরিমাণ বিলিরুবিন সরাসরি রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়। এই কারণে রক্তে সবসময়ই কিছু পরিমাণ বিলিরুবিন উপস্থিত থাকে। যার স্বাভাবিক মাত্রা 1mg/dl এর কম। রক্তের মধ্যে এই বিলিরুবিন, অ্যালবুমিন, প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু এইভাবে যুক্ত হবার একটা সীমা আছে। তাই রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে তা অসংযুক্ত বিলিরুবিন রূপে থাকে এবং সারা শরীরের কোষ কলায় জমা হয় – যা খালি চোখে হলুদ বর্ণের দেখায়। কারণ বিলিরুবিন একটি হলুদ বর্ণের রঞ্জক পদার্থ। সুতরাং রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার বহিঃপ্রকাশই হল – জন্ডিস। আবার শুধু হাতের তালু ও পায়ের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে Carotenemia-এর জন্য – যা ক্ষতিকারক নয়।

কি কি কারণে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়?

(১) লোহিত রক্ত কণিকার অস্বাভাবিক ভাঙ্গন, (২) যকৃতের রোগ, (৩) যকৃৎ থেকে পিত্তথলি ও পিত্তথলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে পিত্তরস সরবরাহে বাধা – রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

শারীরবৃত্তীয় কার্যের ব্যাঘাতের উপর নির্ভর করে জন্ডিসকে তিনভাগে ভাগ করা যায় –

(১) প্রি-হেপাটিক জন্ডিস, (২) হেপাটিক জন্ডিস, (৩) পোস্ট-হেপাটিক জন্ডিস।

প্রি হেপাটিক জন্ডিস

লোহিত রক্ত কণিকার ধ্বংসের হার বৃদ্ধি পাওয়াই এই জন্ডিসের কারণ। লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙ্গনের হার বৃদ্ধি পেতে পারে –

ক) ম্যালেরিয়া, খ) কিছু বংশগত রোগ যেমন – সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসিমিয়া, গিলবার্টস সিনড্রোম (বিলিরুবিন বিপাক হয়), (গ) বৃক্কের কিছু রোগ যেমন Hemolytic uremic syndrome ইত্যাদির জন্য।

স্বাভাবিক অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙ্গে হিমগ্লোবিন থেকে যে বিলিরুবিন তৈরী হয়, তার বেশীর ভাগই যকৃতে পৌঁছে রূপান্তরিত হয়ে পিত্তরসের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত মলের সহিত নিষ্কাশিত হয়। এই কারণেই মলের বর্ণ হলুদ হয়। যখন লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙ্গনের হার ও তা থেকে উৎপন্ন বিলিরুবিনের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন লিভার-এর পক্ষে রক্ত থেকে বিলিরুবিন সংগ্রহ ও পিত্তরসের মাধ্যমে তা নিষ্কাশনের হার আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। ফলে রক্তে অসংযুক্ত বিলিরুবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই প্রকার জন্ডিস দেখা দেয়। যেহেতু অসংযুক্ত বিলিরুবিন জলে দ্রবীভূত হয় না, তাই মূত্রে সাধারণত

বিলিরুবিন পাওয়া যায় না, কিন্তু ইউরোবিলিনোজেন বৃদ্ধি পায়।

সাধারণভাবে পরীক্ষায় পাওয়া যায় –

মূত্রে – কোন বিলিরুবিন নেই, ইউরোবিলিনোজেন > ২ একক

সিরামে – অসংযুক্ত বিলিরুবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি।

হেপাটিক জন্ডিস

যকৃৎ কোষ এর কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং যকৃৎ কোষ নষ্ট হওয়াই এই জন্ডিসের কারণ। যকৃৎ কোষ-এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণ –

সাধারণ ও দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস (অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক হেপাটাইটিস) যা হতে পারে –

(১) নিয়মিত মদ্য পান, (২) বিশেষ কিছু ওষুধ – রিফামপিসিন, আইসোনিয়াজাইড, আইব্রুফেন ইত্যাদি, (৩) বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস আক্রমণ, (৪) কিছু বংশগত রোগের কারণে/জন্য।

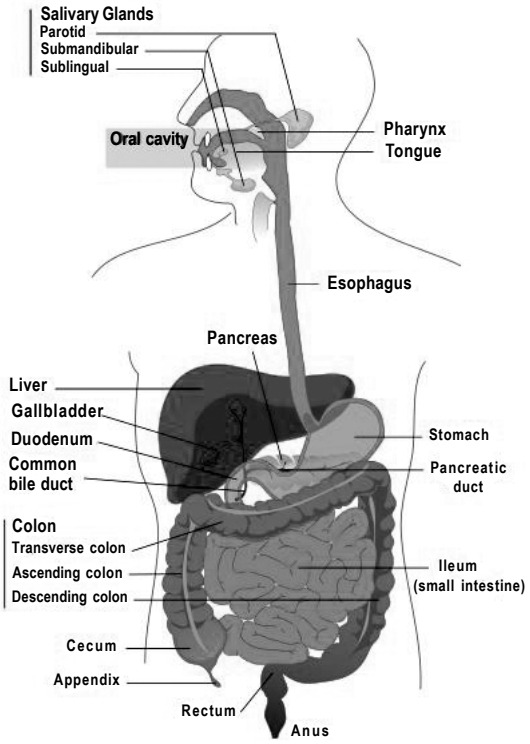

মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র

লিভার কোষগুলির মধ্যে একই সঙ্গে গঠনমূলক ও ভাঙ্গনমূলক কাজ চলে। বাইরে থেকে গৃহীত খাদ্যবস্তু, ওষুধ ইত্যাদি পৌষ্টিকনালীর পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাকের পরে যকৃতে পৌঁছায় পোর্টল শিরার মাধ্যমে। ঐ সারবস্তু যকৃৎ কোষের উৎসেচক দ্বারা শরীরের প্রয়োজন মত গ্রহণযোগ্য এককে পরিণত হয়। আবার শরীরের মৃতকোষ থেকে প্রাপ্ত যে সব পদার্থ শরীরের প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রেরিত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ মল বা মূত্রের সঙ্গে শরীরের বাইরে বের হয়ে যায়। অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে ইউরিয়া এবং নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে ইউরিক অ্যাসিড নির্গত হয়। কোন কারণে লিভার কোষ-এর ক্ষতি হলে, লিভার কোষের স্বাভাবিক কাজ ব্যহত হয়। এই অবস্থায় লিভার কোষে বিলিরুবিন পুনরায় বিলিভার্ডিনে পরিণত হতে পারে না। অপরিবর্তিত বিলিরুবিন পিত্ত এর সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্রে না গিয়ে বেশী মাত্রায় রক্তে ফেরৎ চলে যায়। রক্তে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত উভয় প্রকার বিলিরুবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সাধারণভাবে পরীক্ষায় পাওয়া যায় –

মূত্রে – সংযুক্ত বিলিরুবিন উপস্থিত, ইউরোবিলিনোজেন > ২ একক, প্লাজমা প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন ঘটে।

পোস্ট হেপাটিক জন্ডিস

পিত্ত সরবরাহ নালীতে বাধাই এই প্রকার জন্ডিসের প্রধান কারণ। সাধারণ পিত্ত নালীতে পিত্ত পাথর, অগ্নাশয়ের মুখে ক্যান্সার "Liver-fluke" পরজীবী সাধারণ পিত্ত নালীতে থাকার ফলে, সাধারণ পিত্তনালীর অস্বাভাবিক সংকীর্ণতার কারণে পিত্তসরবরাহ বাধা প্রাপ্ত হয়।

পিত্তরস যকৃৎ থেকে পিত্তনালী বেয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছানোর সময় বাধা পেলে পিত্তনালীতে জমে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছাতে না পারায় পিত্ত পুনরায় যকৃতে ফিরে যায়। ফলে পিত্তরসের সঙ্গে বিলিরুবিন ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছাতে না পেরে সরাসরি রক্তে চলে আসে – দেখা দেয় জন্ডিস। যদিও এক্ষেত্রে যকৃৎ কোষের

কার্য ও গঠনে কোনও অস্বাভাবিকতা থাকে না। বিলিরুবিন ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছাতে না পারায় ইউরোবিলিনোজেনে পরিণত হতে পারে না। এর ফলে মূত্রে ইউরোবিলিনোজেন-এর পরিবর্তে বিলিরুবিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে মলের রং হাল্কা (ফিকে) হয়ে যায়, মূত্র গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়। যকৃতের অন্য রোগের জন্যও এরূপ ঘটতে পারে।

সুতরাং দেখা গেল জন্ডিস লিভার-এর কিছু অসুখের জন্য ঘটতে পারে, আবার লিভার সুস্থ থাকলেও অন্য কারণে জন্ডিস দেখা দিতে পারে। ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স-এর প্রচেষ্টায়, ২০১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ডব্লিউ এইচ ও (হু), ২৮শে জুলাইকে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস রূপে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

হেপাটাইটিস কি?

গ্রীক শব্দ Hepta এর অর্থ Liver যকৃৎ। ডাক্তারি পরিভাষায় itis এর অর্থ "inflammation" অর্থাৎ শরীরের কোন অংশ লালভ-স্ফীত-উষ্ণ এবং প্রায় ক্ষেত্রে যন্ত্রনাময় হয়ে ওঠা। সুতরাং হেপাটাইটিসের অর্থ হল লিভার বা যকৃৎ-এর এমন অবস্থা – যে অবস্থায় যকৃৎ অর্থাৎ যকৃতের কোষগুলি স্ফিত-লালাভ-উষ্ণ ও কোনো কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রনাময় হয়ে ওঠে। যকৃৎ স্ফীত হলে, চিকিৎসকরা বাইরে থেকে পেটে হাত দিয়ে, যকৃতের আয়তন অনুমান করতে পারেন। সুস্থ যকৃৎ সম্পন্ন ব্যক্তির যকৃৎ বাইরে থেকে পেটে হাত দিয়ে বোঝা যায় না। যকৃতের কোষগুলির বিভাজন হওয়ার ক্ষমতা অসীম। ফলে লিভারের অনেক কোষ নষ্ট হয়ে গেলেও লিভার দ্রুত কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে ক্ষয়পূরণ করে – তাই লিভার কোষ ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি স্থায়ী হয় না। কিন্তু লিভার কোষের ধ্বংসের হার যদি লিভার কোষ সৃষ্টির হার অপেক্ষা বেশী এবং ধারাবাহিক হয়, তবে সেই ক্ষতি অপূরণীয়। ফলে লিভার-এর স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা ব্যাহত হয় এবং এই অবস্থা দীর্ঘ দিন হলে হেপাটিক কোমা দেখা দেয় এবং রোগীর মৃত্যু হয়।

হেপাটাইটিস বিভিন্ন কারণে হতে পারে এবং এর মাত্রাও বিভিন্ন হতে পারে। তবে হেপাটাইটিসের মাত্রা সামান্য হলেও প্রায়ই তা জন্ডিস, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা সৃষ্টি করে। হেপাটাইটিস ছয় মাসের কম স্থায়ী হলে তাকে সাধারণ হেপাটাইটিস (অ্যাকিউট হেপাটাইটিস) এবং ছয় মাসের বেশী হলে তাকে দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস (ক্রনিক হেপাটাইটিস) বলা হয়।

ভাইরাস আক্রমণের কারণে হেপাটাইটিস হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বলা হয়। আবার মদ্য পান, বিশেষ কিছু ওষুধ, শিল্পজাত কিছু জৈবপদার্থ (দ্রাবক) এবং এক প্রকার মাসরুম-এর কারণেও হেপাটাইটিস হয়। সাদা ফসফরাস, যুদ্ধে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন যেমন $CHCl_3$, CCl_4 ইত্যাদি। হেপাটাইটিস – সঙ্গে ফ্যাটি লিভার এর জন্য দায়ী।

Non viral-Hepatitis যে যে কারণে হয় –
(i) Drug induced hepatitis
(ii) Toxin can cause hepatitis
(iii) Metabolic disorder can cause hepatitis
(iv) Due to $\alpha - 1$ anti trypsin deficiency
(v) Alcoholic fatty liver disease
(vii) Ischemic hepatitis
(viii) Gaint cell hepatitis

ভাইরাল-হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস এ

এটি যকৃতের এক প্রকার সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি (অ্যাকিউট ইনফেকশাস ডিজিজ) যা হেপাটাইটিস এ ভাইরাস আক্রমণের কারণে ঘটে। প্রতি বছর, বিশ্ব ব্যাপী প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হওয়ার ২-৬ সপ্তাহের মধ্যে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ভাইরাস, আক্রান্ত ব্যক্তির, যকৃৎ কোষে দ্রুত বংশ বিস্তার করে এবং পিত্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে মলের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। রোগ লক্ষণ প্রকাশের ১-২ সপ্তাহ আগে মলে এই ভাইরাসের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে। ভাইরাসের বংশ বিস্তারের হার কমে গেলে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে একটা বিশেষ অ্যান্ডিবডি (IgM anti HAV) তৈরী হয় যা ২ থেকে ৬ মাস পরে রক্তে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু IgM anti HAV পরবর্তী সারা জীবন প্রতিরোধ বজায় রাখে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে – অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বেশী – শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশী হয়। কিন্তু ৯০% শিশুর ক্ষেত্রে এর রোগ লক্ষণ চোখে পড়ে না, তবে যে অ্যান্টি-বডি তৈরী হয় তা সারা জীবন সুরক্ষা দেয়। যদিও ১০-১৫% ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই রোগের পুনঃআবির্ভাব ঘটেছে। এই ভাইরাস জল ও খাদ্য দ্বারা সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির এঁটো খাবার ও জল এবং ঐ ব্যক্তির মল দ্বারা দূষিত জল দ্বারা সংক্রামিত হয়। যৌন সংসর্গের ফলেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ডিটারজেন্ট, অ্যাসিড, ইথার, ক্লোরোফর্ম এবং ৬০°সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করেও এই ভাইরাস মারা যায় না। ক্লোরিন, ফরমালিন

(০.৩৫%, ৩৭°সে, ৭২ ঘন্টা) এবং ইউ ভি রশ্মি দ্বারা ভাইরাস মুক্ত করা যায়। এইচ এ ভ্যাক্সিন ৯৫%-এর চেয়ে বেশী ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে যার মেয়াদ কমপক্ষে ১০ বছর বলে ডব্লিউ এইচ ও-এর দাবী। ১ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন প্রযোজ্য নয়। এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই। উন্নত দেশগুলিতে, স্বাস্থ্য সম্মত পানীয়, খাদ্য, পায়খানা, নর্দমা-ব্যবস্থা এই রোগের প্রকোপ হ্রাস করেছে। কিন্তু যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগের নেশা করে, যারা সমকামী এবং যারা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ভ্রমণ করেন তাদের ক্ষেত্রে এইচ এ ভি দ্বারা আক্রান্ত হবার হার ও সম্ভাবনা দুইই বেশী।

২০০৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ এ ভি দ্বারা দারুনভাবে আক্রান্ত হয় বহু মানুষ যার মধ্যে ৬৪০ জনের অবস্থা খুব খারাপ হয়। এরা সকলেই একই রেস্টুরেন্ট-এর খাবার খেয়েছিল। ১৯৮৮তে চীনের সাংহাইতে একটি দূষিত-সংক্রামিত নদীর চিংড়ি মাছ ও ঐ জাতীয় কিছু জলজ প্রাণী ভক্ষণ করায় প্রায় ৩০০০০০ জন এইচ এ ভি দ্বারা আক্রান্ত হন।

হেপাটাইটিস বি

এই রোগ মানুষ সহ সমস্ত হোমিনিডাদের (Hominoida) হয়। এই রোগ "সিরাম – হেপাটাইটিস" নামে পরিচিত। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে Baruch Blumber, অস্ট্রেলীয়ান অ্যান্টিজেন [যা পরবর্তীতে জানা যায় hepatitis B Surface Antigen] আবিষ্কার করলেও এইচ বি ভি'কে আবিষ্কার করা যায় ১৯৭০ সালে এবং ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে এর ভ্যাক্সিন পাওয়া যায়।

সংক্রামিত রক্ত, সংক্রামিত দেহরস [যেমন বীর্য (Semene), vaginal fluids] দ্বারা এই ভাইরাস সংক্রামিত হয়। যারা এই ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদী বাহক (ক্রনিক ক্যারিয়ার) তাদের লালারসে, চোখের জলে এবং মূত্রে এই ভাইরাসের ডি এন এ পাওয়া যায়। জন্মের ঠিক পূর্বে বা পরে, রোগ গ্রস্থ মায়ের শরীর থেকে শিশু দেহে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্ত গ্রহণ ও সঞ্চালন, ডায়ালিসিস সম্পর্কিত কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের ক্ষেত্রে অসাবধানতা এই রোগ সংক্রমণের কারণ হতে পারে। কিন্তু এই রোগ খাদ্য, পানীয় বা খাদ্য-পানীয়-এর পাত্র দ্বারা সংক্রামিত হয় না। দুগ্ধ পোষ্য শিশুর রোগগ্রস্থ মায়ের দুধ পানের মধ্য দিয়ে সংক্রমণ ঘটে না। এই ভাইরাসের বংশ বিস্তার যকৃতেই ঘটে। এই ভাইরাসের সনাক্তকরণ করা হয় উৎপন্ন হওয়া ভাইরাল অ্যান্টিজেন অথবা অ্যান্টিবডি দ্বারা। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাটিকে বলা হয় ASSAYS TEST।

এইচ বি ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশের জন্য কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। ভাইরাসের সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী কিছুদিন পরে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। যাদের ক্ষেত্রে এই রোগের মাত্রা ভয়াবহ হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা শুরু করা হয়। এদের সংখ্যা ১%-এর কম। বরঞ্চ যাদের, এই রোগ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা একান্তভাবে প্রয়োজন সিরোসিস অফ লিভার বা লিভার ক্যান্সার যাতে না হয়। যদিও কোনও ঔষধই এইচ বি ভাইরাসকে মারতে পারে না, তথাপি ভাইরাস-এর প্রতিলিপি গঠন বন্ধ রাখতে পারে – ফলে লিভারের ক্ষতি কম হয়।

এইচ বি ভি-এর সংক্রামিত হওয়ার ক্ষমতা এইচ আই ভি-এর সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতার ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশী। মানুষের দেহের বাইরে এই ভাইরাস কমপক্ষে ৭ দিন জীবিত ও সক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় যে কোনও ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতে পারে যা এইচ আই ভি পারে না। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যারা তাদের ৯০% এইচ বি ভি দ্বারা আক্রান্ত হলেও ছয় মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে।

এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু ধরনের ভ্যাক্সিন প্রতিষেধক আছে। ১) HB_s Ag ঈস্ট বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীরে HB_sAg এর জিন প্রবেশ করিয়ে প্রস্তুত করা হয়। ২) ক্রনিক এইচ বি ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের প্লাজমা থেকে সংগৃহীত HB_sAg কে বিশুদ্ধকরণ/পরিশ্রুত করে।

শিশুর জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রথম ডোজ, জন্মের ৭ দিন পরে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে কোন ফল পাওয়া যায় না। প্রথম ডোজ-এর পর কোনও শিশুর মারাত্মক অ্যালার্জি হলে, তাকে আর এইচ বি ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা যায় না। রোগ হবার আগে বা রোগ লক্ষণ ধরা পরার ৭ দিনের মধ্যে এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে, ভাল ফল পাওয়া যায়। কোন শিশুর বেশী জ্বর থাকা অবস্থায় এই ভ্যাক্সিন দেওয়া উচিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভ্যাক্সিন শরীরের যেস্থানে ইঞ্জেক্ট করা হয় – তা ফুলে ওঠে ও যন্ত্রণা হয়। এই ঘটনা গড়ে প্রতি ১১ জনে ১ জনার হয়। এই ভ্যাক্সিনকে ২° – ৮°সে-এর মধ্যে সংরক্ষণ করতে হয় এবং প্রত্যেক ডোজ ০.৫ এম এল। ক্যাম্প করে যে ভ্যাক্সিন দেওয়া হয় – তাতে এই বিষয়গুলি রক্ষিত হয় কি? ভ্যাক্সিন এর ডোজ এবং প্রতিষেধকের মেয়াদ নিয়ে

বিভিন্ন মত আছে।

ডব্লিউ এইচ ও'র সমীক্ষা –

ক) ২০০৪-এ বিশ্বব্যাপী ৩৫০ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত।

খ) ২০১০-এ চীনে ১২০ মিলিয়ন, ভারতে ৪০ মিলিয়ন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ১২ মিলিয়ন মানুষ এইচ বি ভি-এর দ্বারা আক্রান্ত

গ) প্রতি বছর বিশ্ব ব্যাপী ২ বিলিয়ন মানুষ এইচ বি ভি দ্বারা আক্রান্ত হন, যাদের মধ্যে ২৪০ মিলিয়ন মানুষ ক্রনিক লিভার-এর অসুখে অসুস্থ হন এবং প্রায় ৬০০০০০ জন মানুষ মারা যায়।

তাই ডব্লিউ এইচ ও সুপারিশ করেছে সমস্ত শিশুকে এইচ বি ভি-এর ভ্যাক্সিন দিতে। কিন্তু এইচ বি ভ্যাক্সিন-এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট আছে – দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা (ক্রনিক ইলনেস), ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোম, বহুমূত্র (ডায়াবেটিস), অটোইমিউন ডিসঅর্ডার ইত্যাদি।

বর্তমানে ডব্লিউ এইচ ও pentavalent vaccin এর সুপারিশ করেছে। যদিও পৃথকভাবে দেওয়া ভ্যাক্সিন-এর তুলনায় পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাক্সিন কতটা কার্যকরী তার উপযুক্ত ও যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

যারা ক্রনিক এইচ বি-তে ভুগছেন, তাদের চিকিৎসার খরচ ১০০০ মার্কিন ডলার প্রতিবছর।

হেপাটাইটিস সি

এই রোগের প্রায় ক্ষেত্রেই বহিঃপ্রকাশ থাকে না। কিন্তু ক্রনিক ইনফেকশন বহু বছর পরে ধরা পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লিভার-এর সিরোসিস হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ হয়। এইচ সি ভি সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে (ব্লাড টু ব্লাড কন্টাক্ট), ইনফেকশনের মাধ্যমে শিরার মধ্য দিয়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণ, অপারেশন-এর যন্ত্রপাতি নির্বিজকরণ (স্টেরিলাইজড) না থাকলে সংক্রামিত হয়। এই ভাইরাস মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর দেহে সংক্রামিত হয়। প্যাথলজি পরীক্ষায় নন-এ, নন-বি হেপাটাইটিস (এন এ এন বি এইচ)কে হেপাটাইটিস সি রূপে চিহ্নিত করা হত। ১৯৮৮তে এই ভাইরাস নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং ১৯৮৯তে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হয়। এই ভাইরাস দ্বারা দীর্ঘদিন আক্রান্ত থাকার ফলে যাদের সিরোসিস অফ লিভার অথবা লিভার ক্যানসার হয় – তাদের অনেকের লিভার প্রতিস্থাপনের (লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট) প্রয়োজন হয় – যদিও তাদের দেহ প্রায়ই পুনরায় এইচ সি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। **এই ভাইরাস দ্বারা সাধারণভাবে (অ্যাকিউট ইনফেকশন) আক্রান্তদের ৫০%–৮০% ভাইরাসের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরাময় ঘটে।**

উন্নত দেশগুলিতে এইচ সি সংক্রামিত হয় প্রধানতঃ ইনট্রাভেনাস ড্রাগ ইউজ (আই ডি ইউ)-এর মাধ্যমে আর উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে সংক্রামিত হয় প্রধানভাবে ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং নিরাপদ নয় এমন ডাক্তারি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। আমেরিকা সহ ২৫টি উন্নত দেশে এইচ সি ভাইরাস ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হওয়ার কারণ রূপে চিহ্নিত করা গেছে আই ডি ইউ (এদের ৬০% থেকে ৮০%)। ১২টি দেশে আই ডি ইউ'দের ৮০% এইচ সি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। গত শতাব্দির ৮এর দেশকে **ট্যাটু অঙ্কন প্রচলন** এই সংক্রমণকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। মিশরে (ইজিপ্ট) এইচ সি-এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশী।

যদিও যৌন ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে এইচ সি ভাইরাস ছড়িয়ে পরা নিয়ে মতভেদ আছে তবুও স্বাভাবিক ও একগামী-দের (মোনোগ্যামাস হেটেরোসেক্সুয়াল কাপ্‌ল) ক্ষেত্রে এর কোনও সম্ভাবনা নাই। সমকামী, বহুগামীদের ক্ষেত্রে এইচ সি সংক্রমণ রোধ করতে মার্কিন সরকার কনডোম ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। **খাবার ও জলের মধ্য দিয়ে এইচ সি ভাইরাস সংক্রামিত হয় না।**

এইচ সি দ্বারা আক্রান্ত মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ১০% চেয়ে কম। কিন্তু অন্তঃস্বত্তা হওয়ার সময়, নাকি গর্ভাবস্থায়, নাকি সন্তান প্রসবের সময় সংক্রমণ ঘটে তা জানা যায় নি। **স্তন্য পানের মধ্যে দিয়ে শিশুর শরীরে সংক্রামিত হবার কোনও ঘটনা বা প্রমাণ নাই, তথাপি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে সংক্রামিত মাকে স্তনদানে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।**

ক্রনিক ইনফেকশন-এর ক্ষেত্রে ৪০%-৮০%, ২৪-৪৮ সপ্তাহের চিকিৎসায় (সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট) সুস্থ হয়। সামান্য একটা অংশ বিনা চিকিৎসায় সুস্থ হয়। **এইচ সি ভি প্রতিরোধ করার কোনও ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কার হয়নি।**

বর্তমান বিশ্বে ১৩০-১৭০ মিলিয়ন মানুষ ক্রনিক এইচ সি-ভাইরাস দ্বারা অসুস্থ। প্রতি বছর গড়ে ৩-৪ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে এইচ সি ভি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং প্রতি বছর গড়ে ৩,৫০,০০০ মানুষ এইচ সি সংক্রান্ত রোগে মারা যায়। **এইচ সি দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রধানত আই ডি ইউ (ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ইউজ)-এর জন্য।** ২০০৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী একজন ক্রনিক এইচ সি

রোগীর চিকিৎসার জন্য **সারা জীবনে খরচ পড়ত ৩৩,৪০৭ মার্কিন ডলার**। ২০১১ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুযায়ী, এইরূপ একজন রোগীর **যকৃৎ প্রতিস্থাপন (লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট) সমেত খরচ পড়ে ২,০০,০০০ মার্কিন ডলার।**

হেপাটাইটিস ডি

হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস, হেপাটাইটিস ডেল্টা ভাইরাস নামেও পরিচিত। মানবদেহে এইচ ডি ভাইরাসের প্রবেশ ঘটে এইচ বি ভাইরাসের সঙ্গে অথবা এইচ বি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে এইচ ডি ভাইরাসের প্রবেশ ঘটে। এই কারণে এইচ ডি ভাইরাসকে সাবভাইরাল স্যাটেলাইট ভাবা হয়। এছাড়া এইচ বি ভাইরাসের অনুপস্থিতিতে এইচ ডি ভাইরাসের বংশ বিস্তার ঘটে না। এইচ বি ভাইরাসের উপস্থিতিতে এইচ ডি-এর যৌথ সংক্রমণ শুধুমাত্র এইচ বি-এর সংক্রমণ অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়াবহ, মৃত্যুর হার সবেচেয়ে বেশী – আক্রান্ত দের ২০%।

এইচ ডি ভাইরাসের কথা প্রথম জানা যায় ১৯৭৭-এর মধ্যভাগে, ইতালিয় গবেষক মারিও রিজেট্টো'র অনুসন্ধান থেকে। **এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রধান আই ডি ইউ-দের (ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ইউজ) ক্ষেত্রে ঘটে।**

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ এইচ বি ও এইচ ডি দ্বারা যৌথভাবে আক্রান্ত। উন্নত দেশগুলিতে এইচ বি-এর চিকিৎসা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয় বলে এইচ ডি-এর সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু আই ডি ইউ'রা এই কমার সম্ভাবনাকে বিপরীত দিকে চালিত করে।

হেপাটাইটিস ই

হেপাটাইটিস ই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউ দিল্লীতে। এই ভাইরাস দ্বারা ১৫-৪০ বছরের তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশী। নির্দিষ্ট সময় পরে আপনা আপনি সেরে যাওয়ার কারণে – মৃত্যুর হার কম। **কিন্তু ধারাবাহিকভাবে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে – পরিণতি ভয়ানক।** আক্রান্ত অবস্থায় – কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। যারা আক্রান্ত হন তাদের ২% মারা যায়। **গর্ভবতী মহিলাদের এই রোগ প্রায় ক্ষেত্রে খুব মারাত্মক হয়।** বিশেষত যারা **3rd trimester**-এ আছে। এইরূপ মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় ২০% মারা যায়।

এইচ ই প্রধানত উন্নয়নশীল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে প্রসার ঘটেছে, যেমন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ভারত, মধ্য আমেরিকা। **এইচি ই জলবাহিত রোগ, সংক্রামিত হয় প্রধানত পানীয় জল ও খাবার দ্বারা। কেবলমাত্র এইচ ই দ্বারা আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে নিষ্কাশিত মল দ্বারা জল দূষণের ফলে সংক্রামিত হয়। এই রোগের সুনির্দিষ্ট কোনও ভ্যাকসিন নাই।** এর চিকিৎসায় ভাইরাল ইনফেকশন-এর ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়। চলতি বছরের (২০১২) সূচনায় চীনে একটি পৃথক ভ্যাকসিন'কে এইচ ই-এর চিকিৎসার জন্য সরকারীভাবে সুপারিশ করা হয়েছে – যা গত ১২ মাসে ৫০,০০০ মানুষের দুটি গ্রুপের উপর ৩ বার করে প্রয়োগ করায় দেখা গেছে – যারা ঐ ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তাদের কারও এইচ ই হয়নি। এই ভ্যাকসিন পৃথিবীর সর্বত্র সহজলভ্য নয়। **এইচ ই দ্বারা বার বার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও আছে।**

এইচ ই'র সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কয়েকটি উদাহরণ

স্থান	সময়	রিপোর্টেড আক্রান্ত
নতুন দিল্লী	১৯৫৫-১৯৫৬	৩০,০০০
বার্মা	১৯৭৬-১৯৭৭	২০,০০০
কাশ্মীর	১৯৭৮	৫২,০০০
কানপুর	১৯৯১	৭৯,০০০
চীন	১৯৮৬-১৯৮৮	১,০০,০০০
সুদান	২০০৪	২,৮৬,৮৬১

ভাইরাল হেপাটাইটিস ও জন্ডিস সম্পর্কে আমরা যে চিত্র পেলাম তা থেকে সহজেই অনুমেয় ভাইরাল হেপাটাইটিস দ্বারা আক্রান্ত ও মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশী। যদিও অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিসিস কম নয়।

				ভ্যাকসিন
হেপাটাইটিস এ	–	জলবাহিত	–	আছে
হেপাটাইটিস বি	–	রক্তদ্বারা/ দেহজ রস দ্বারা	–	আছে
হেপাটাইটিস সি	–	সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে/ আই ডি ইউ/ট্যাটু	–	নাই
হেপাটাইটিস ডি	–	বি এর সঙ্গে	–	নাই
হেপাটাইটিস ই	–	জলবাহিত	–	নাই*

**২০১২ খ্রীষ্টাব্দে এর ভ্যাকসিন আবিষ্কারের দাবি করেছে চীন।*

ভাইরাল হেপাটাইটিস থেকে পরিত্রাণ/প্রতিকার এর

প্রধান উপায় –

১) বিশুদ্ধ পানীয় ও ব্যবহার যোগ্য জল সকলের জন্য সরবরাহ করা।

২) প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবস্থা।

৩) স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী।

৪) যে কোনও প্রকার অপারেশনের পূর্বে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি নির্বীজকরণ (স্টেরিলাইজ) করা।

৫) রক্তদান ও রক্ত গ্রহণের পূর্বে হেপাটাইটিস বি ও সি সনাক্তকরণ পরীক্ষা করা।

৬) আই ডি ইউ (ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ ইউজ), সমকামীতা, বহুগামীতা বন্ধ করা।

আদর্শ পানীয় জল প্রস্তুত ও বন্টন

মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজে এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানবজীবনে মিঠা জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভূ-পকৃতির উপর নির্ভর করে জলের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের কম বেশী জলের স্বাদ ও ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে জলের উৎস ছিল নদী,হ্রদ, ঝর্ণা। পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছে পুকুর, কুঁয়ো। আধুনিক যুগে এসেছে গভীর নলকূপ। নদী, হ্রদ, পুকুর, কুঁয়ো ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করত এবং করে।

বালি (ক্রুড স্যান্ড) ও চারকোল-এর সাহায্যে জল পরিস্রুত করে পান করার কথা ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের ইতিহাস থেকে জানা যায়। প্রায় সমসাময়িককালে হিপোক্রেট একটি কাপড়ের ব্যাগ তৈরী করেন যার দ্বারা স্ফুটনের পর জলের সেডিমেন্ট ছেঁকে ফেলা হত। মধ্যযুগে জলের মান-এর সঙ্গে বিভিন্ন রোগের সম্পর্ক স্থাপন শুরু হয়। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে কলেরার প্রকোপ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায় পরিস্রুত জল ব্যবহারের ফলে। রসায়ন বিদ্যা ও জীবানু সংক্রান্ত গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জানা গেছে জলের মধ্যে বেশ কিছু পদার্থ মানব দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক ও নানা রোগের কারণ। এই ক্ষতিকারক মৌল, যৌগ ও জীবানুগুলির আকার ও আয়তন এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই খালি চোখে দেখে স্বচ্ছ না অস্বচ্ছ – তার ভিত্তিতে পানীয় ও ব্যবহার যোগ্য জল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পানীয় জলের মান নির্ধারণ করা হয়, সংক্রামিত দ্রব্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রা দ্বারা। ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে হু-এ এক রিপোর্টে বলা হয় সারা বিশ্বে ১.১ বিলিয়ন মানুষের উপযুক্ত পানীয় জল পাবার ব্যবস্থা নাই, ৪ বিলিয়ন ডাইরিয়া ঘটনার মধ্যে ৮৮% ঘটে উপযুক্ত পানীয় জল, পায়খানা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের অভাবের জন্য এবং প্রতি বছর ডাইরিয়ায় মারা যায় ১.৮ মিলিয়ন মানুষ। হু-এর মতে এদের ৯৪%কে বাঁচানো সম্ভব বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রস্তুত করতে, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত মিঠা জলের উপর কতগুলি ভৌত (ফিজিকাল) ও কতগুলি রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। সমুদ্রের জলের ক্ষেত্রে প্রথমে লবনমুক্ত করে এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে হয়।

ভৌত পদ্ধতি

পরিস্রুত পদ্ধতিতে জলের মধ্যে উপস্থিত অদ্রাব্য কণাগুলিকে ছাকনির ছিদ্রের মাপ ও কণাগুলির মাপ অনুযায়ী পৃথক করা যায়/হয়। তবে র‍্যাপিড স্যান্ড ফিলট্রেশন, স্লো স্যান্ড ফিলট্রেশন, মেমব্রেন ফিলট্রেশন – কোন ফিলট্রেশন পদ্ধতিতেই জলে দ্রবিভূত পদার্থ যেমন ফসফরাস নাইট্রেট এবং ভারী ধাতু, জল থেকে পৃথক করা যায় না।

রাসায়নিকভাবে গঠিত, আনুবিক্ষণিক ছিদ্রযুক্ত (মাইক্রোস্কোপিক পোরস্) পলিমার পর্দা দ্বারা আলট্রাফিলট্রেশন পদ্ধতিতে জলে দ্রবীভূত বহু কণাকে পৃথক করা যায় ছিদ্রের মাপ ও জলের চাপ অনুযায়ী।

আয়নবিনিময় পদ্ধতিতে Ca^{+2} ও Mg^{+2} প্রতিস্থাপন করা হয় K^{+} ও Na^{+} দ্বারা। ইলেকট্রো ডিআয়োনাইজেশন পদ্ধতিতে জলকে সম্পূর্ণ আয়নমুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু এর পূর্বে রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে জৈব পদার্থগুলিকে পৃথক করা দরকার।

স্ফুটনের ফলে জলের ক্ষরতা কিছুটা হ্রাস পায় এবং জলে অবস্থিত জীবানু ধ্বংস হয়। কিন্তু স্ফুটনের পরে জল দীর্ঘস্থায়ীভাবে জীবানুমুক্ত থাকার নিশ্চয়তা থাকে না – কারণ জলের মধ্যে কোন জীবানুনাশক উপস্থিত থাকে না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমিতলের উচ্চতা অনুযায়ী স্ফুটনের সময়কাল স্থির করা হয়। ক্যালসিয়াম বাদে জল অপেক্ষা বেশী স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট পদার্থ জলের স্ফুটনের ফলে পৃথক হয় না।

ইউ ভি রশ্মি স্বচ্ছ জলের জীবানু নাশ করতে কার্যকরী। যদিও এ ক্ষেত্রেও জলের মধ্যে কোনও জীবানুনাশক উপস্থিত না থাকায় জল পুনরায় জীবানু দ্বারা দূষিত হতে পারে।

রাসায়নিক পদ্ধতি

জলকে সম্পূর্ণরূপে জীবনুমুক্ত করতে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে জীবানুমুক্ত রাখতে কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ক্লোরিন ডাই অক্সাইড, ক্লোরামাইন ও

ওজোন ব্যবহার করা হয়।

সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে ক্লোরিন মুক্ত করে যায় জীবনুকে ধ্বংস করে। কিন্তু জলের মধ্যে উপস্থিত প্রাকৃতিক জৈব পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ট্রাই হ্যালো মিথেন (টি এইচ এম) এবং হ্যালো-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (এইচ এ এ) উৎপন্ন করে যা মানব দেহে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। এই ক্ষতিকারক প্রভাব যতদূর সম্ভব কম করার জন্য, ক্লোরিন ব্যবহার-এর পূর্বে জল থেকে জৈব উপাদানগুলি পৃথক করা উচিত। ক্লোরিন সমস্ত ব্যাকটিরিয়াকে মারতে পারলেও, জলের মধ্যে যেসব প্রোটোজোয়া সিস্ট গঠন করে অবস্থান করে তাদের মারতে পারে না।

ক্লোরামাইন (ক্লোরিন+অ্যামনিয়া)-এর জীবানুনাশক ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু জলের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে জীবানু নাশক রূপে কাজ করে এবং টি এইচ এম ও এইচ এ এ গঠন করে না। আবার এর দ্বারা জল জীবানুমুক্ত করণের ফলে জলে নাইট্রেট যৌগ বেড়ে যায়।

জলবাহিত প্রায় সব জীবানু ওজোন (O_3) দ্বারা ধ্বংস হয়, সিস্ট গঠন কারী প্রোটোজোয়াও ধ্বংস হয়। কিন্তু ব্রোমাইড আয়নের সঙ্গে ওজোন বিক্রিয়া করে ব্রোমেট যৌগ গঠন করে যা মানব দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। ওজোন কিন্তু জলের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জীবানুনাশক রূপে অবস্থান করে না।

ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরিশোধন ও জীবানুমুক্ত করলেও বিশুদ্ধ পানীয় জল হয় না। জলের অম্ল-খারের মাত্রা আমাদের শরীরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশুদ্ধ জলের pH প্রায় ৭, সমুদ্রের জলের pH মান ৭.৫-৮.৪, অর্থাৎ সমুদ্রের জল মৃদুভাবে ক্ষারীয়। ভূ-প্রকৃতি ও অ্যাসিড বৃষ্টির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন স্থানের জলের pH এর মান বিভিন্ন। তাই বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে জলের pH-এর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

পাতন প্রক্রিয়ায় এবং মেমব্রেন দ্বারা রিভার্স অস্‌মোসিস্ পদ্ধতিতে জল বিশুদ্ধ করণের ফলে জলে উপস্থিত বহু প্রয়োজনীয় খনিজ মৌল জল থেকে বাদ পরে যায়। এই প্রয়োজনীয় খনিজগুলির অভাব পূরণ করেই আদর্শ পানীয় জল প্রস্তুত করা সম্ভব।

সুতরাং জীবানুমুক্ত, সমস্ত রকম ক্ষতিকারক পদার্থমুক্ত, উপযুক্ত মাত্রায় শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ লবন যুক্ত এবং pH এর মান ৭-এর কাছাকাছি বিশিষ্ট জল হল আদর্শ পানীয় জল – যা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা সম্ভব।

সুতরাং বিশুদ্ধ পানীয় ও ব্যবহারযোগ্য জল প্রস্তুত বিভিন্ন এবং ধারাবাহিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব। ভূ-প্রকৃতি, জলের উৎস, পরিবেশ অনুযায়ী জলে উপস্থিত মানুষের ক্ষতিকারক এবং ব্যবহারিক জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি করে – এমন পদার্থগুলির উপর নির্ভর করে জল বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। বিশুদ্ধ করণ সম্পন্ন হওয়ার পরে তা যাতে উপযুক্ত গুণমানে মানুষের কাছে পৌঁছায় তার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনামাফিক সরবরাহ ব্যবস্থা করা দরকার। বন্টন ও সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন যেন সম্পূর্ণ লিক্ মুক্ত হয়। সরবরাহ পাইপ লাইন যেমন নর্দমার জলের সংস্পর্শে না থাকে এবং যথেষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে। পাইপ লাইন যে অঞ্চলে বসান হয়েছে সে অঞ্চলে যানবাহন চলাচল হিসাব করে, পাইপের উপর কিরূপ লোড্ পড়তে পারে তা হিসাব করে পাইপের উপাদানের গুণমান স্থির করা দরকার। সরবরাহকৃত জলে উপস্থিত ও অনুপস্থিত খনিজ লবন অনুযায়ী পাইপ লাইনের ভিতরের দেওয়ালে প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি?

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সকলের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। এই দেশগুলিতে যে সব অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে – সে সব অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় ও ব্যবহারযোগ্য জল পাওয়ার নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময়ই সরবরাহকৃত জলের মধ্যে কেঁচো, জোঁক নানারকম কীট ও ময়লা পাওয়া যায়। এগুলি নয় চোখে দেখা যায়, কিন্তু ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি জীবানুগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। তাই সরবরাহকৃত জলের মধ্য দিয়ে কোনও জীবানু সরবরাহ হচ্ছে কিনা তা বলা সম্ভব যদি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত, একই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরবরাহকৃত জল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা যায়। **এরূপ কোনও ব্যবস্থা চালু নেই।** আর জল পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকার জন্য, মাঝে মধ্যেই এই জলবন্টন ব্যবস্থাই একটি নির্দিষ্ট ও বৃহৎ এলাকাজুড়ে নির্দিষ্ট কতগুলি জলবাহিত রোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। যেমন – কলেরা, আন্ত্রিক, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস ই ইত্যাদি। এই সব রোগের ক্ষেত্রই ঔষধ বিক্রির বাজারকে চাঙ্গা করে। ক্ষেত্র যত বড় হয় – বাজার তত চাঙ্গা হয়। তবে জেনে রাখা দরকার, আজ পর্যন্ত এমন কোনও ওষুধ আবিষ্কার হয় নি যা লিভারের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

সমগ্র আলোচনায় কি পেলাম, কেন পেলাম

হেপাটাইটিস সি, হেপাটাইটিস ডি, হেপাটাইটিস ই-এর ভ্যাকসিন নেই। সর্বসাধারণের জন্য এইচ বি-এর ভ্যাকসিন কতটা প্রয়োজন? সার্জেন্ট ও রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য

কর্মীদের এইচ বি ভ্যাকসিন অবশ্যই প্রয়োজন। পরিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবস্থাই এইচ এ'কে প্রতিরোধ করতে পারে – তার জন্য ভ্যাকসিন এর প্রয়োজন কোথায়! যদি এইচ এ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়, তবে এইচ ই-ও প্রতিরোধ করা যাবে – কারণ এইচ ই সম্পূর্ণরূপে জলবাহিত রোগ। এইচ বি না হলে এইচ ডি হবার প্রশ্নই ওঠে না।

ভাইরাস ঘটিত হেপাটাইটিসের কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা আপনা-আপনি সেরে যায়। রোগাক্রান্তদের জন্য প্রয়োজন – সম্পূর্ণ বিশ্রাম, নতুন করে ইনফেকশন না হতে দেওয়া, স্বাস্থ্য-সম্মত সহজপাচ্য সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল।

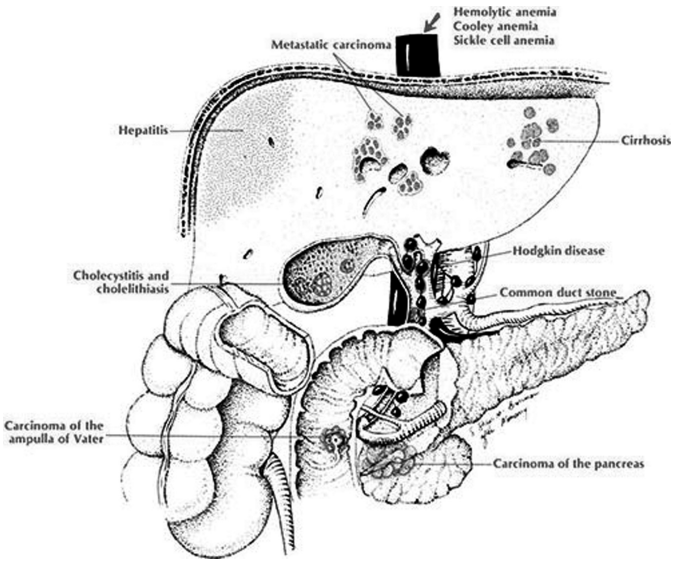

অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য সম্মত উন্নত পায়খানা ব্যবস্থা নাই। ফলে বর্ষার সময় বা বন্যায় পরিত্যক্ত মল দ্বারা জল দূষণ হয়। এছাড়া সারা বছর ধরে, খালের ধারে খাঁটা পায়খানা জল দূষণ ঘটায়।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে কাঁচা, আধসিদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস যেখানে প্রচলিত সেখানে জল ফুটিয়ে খাওয়ার পয়সা কোথায়? তাছাড়া ফুটনো জল পুনরায় সংক্রামিত হতে পারে।

আই ডি ইউ-এর মাধ্যমে নেশা, শরীর উন্মুক্ত করে ট্যাটু অঙ্কন ও প্রদর্শন, সমকামিতা, যথেচ্ছ যৌনকামিতা বিদ্যমান ব্যবস্থার ধারক সংস্কৃতির ফল। যদিও বহুগামীতা পুরানো ব্যবস্থাতেই চালু ছিল।

সরকারী/বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই – ডাক্তারী যন্ত্রপাতি নির্বিজকরণ না হওয়ার কারণে এবং পরীক্ষা ব্যতীত রক্তদান ও রক্তগ্রহণের কারণে অনাবশ্যক বহু মানুষ বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাও গেছেন, এমন উদাহরণ অনেকেরই জানা আছে। জল সম্পূর্ণ পরিস্রুত না করেই সরবরাহ করা বা সরবরাহ ক্ষেত্রের পাইপ লাইন ফেটে নোংরা জল মিশে যাবার ঘটনা নতুন কিছু নয়।

যা সকলের চোখে ধরা পড়ে না

এই সকল কাজে নিযুক্ত কর্মীদের গাফিলতি অমার্জনীয়। কিন্তু এই অমার্জনীয়তা যদি শুধুমাত্র কর্মীদের দোষীসাব্যস্ত করে তবে তা ব্যবস্থার গাফিলতিকে আড়াল করে। ব্যবস্থার গাফিলতি ব্যবস্থার স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে না। যদি তা করত তবে গাফিলতির শুদ্ধিকরণ ঘটত। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশের অর্থনীতি – বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত। বাজার সর্বস্ব অর্থনীতির "জল বন্টন ব্যবস্থা", "স্বাস্থ্য ব্যবস্থা" – সবই বাজার সৃষ্টির পরিপূরক। তাই রোগ সংক্রামিত না হওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে, রোগ ছড়িয়ে পড়া ও ব্যক্তিগতভাবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়। আক্রান্তদের দু-চার জন মারা গেলে, বাজার আরও চাঙ্গা হয়। প্রতিষেধক টিকার চাহিদা বেড়ে যায়। টিকাও বাজারের পণ্য। সুতরাং বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়, অন্যান্য আরও অনেক রোগের মতন ভাইরাল হেপাটাইটিস ও জন্ডিস বাজার সৃষ্টির উপাদান মাত্র।

এর থেকে মুক্তির পথ একটাই – নিজ নিজ এলাকায় সমবেতভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগে সুষ্ঠু – স্বাস্থ্য সম্মত জল বন্টন ব্যবস্থা দাবী করা এবং দাবী আদায় করা। ঐক্যবদ্ধ মানুষ কিনা পারে! ■

রিপোর্ট

"কৃষি সংকট এবং জিন পরিবর্তিত শষ্য" – এফ এ এম এ আয়োজিত সেমিনার

গত ৩০ অগাস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে (সেন্টিনারী হল) "একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (এফ এ এম এ)"-র ডাকা আলোচনার বিষয় ছিলো – "কৃষি সংকট ও জিন পরিবর্তিত শষ্য"। তবে মুখ্য আলোচক এফ এ এম এ কর্তৃপক্ষের ছিলেন না। একজন ফাউন্ডার ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর সেলুলার মলিকিউলার বায়োলজি। অন্যজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, নতুন দিল্লী।

বক্তাদের বক্তব্যে নানান দিক উঠে আসে। জিন পরিবর্তিত (জিএম) শষ্য শুধু মানব স্বাস্থ্যেরই নয়, পশু-পাখি ও মাটির জন্যও ক্ষতিকর। গোটা বাস্তুতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। জৈব বৈচিত্র্য এ জন্য ধ্বংস হচ্ছে। বেগুন বৈচিত্র্যে ভারত পৃথিবীর সেরা। তাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছিল বিটি বেগুন চাষের মাধ্যমে। কোন প্রকারে তা ঠেকানো গেছে। এখন তোড়জোড় চলছে বিটি তুলা চাষের, ধান চাষের। চল্লিশ হাজারের উপর ধানের প্রজাতি আজ কয়েকশতে এসে ঠেকেছে। আমাদের চাষীরা শত শত বছর ধরে প্রাকৃতিক উপায়ে যে জৈব বৈচিত্র্য ঘটিয়ে চলছে এবং তাকে সংরক্ষণ করছে, আজ তা ধ্বংসের মুখোমুখি। শুধু কি তাই? জিএম প্রযুক্তিতে বাইরের বীজ, সার, কীটনাশক অচল। একমাত্র বিশেষ কৃষি-রাসায়নিক (অ্যাগ্রো কেমিক্যাল) প্রযোজ্য। আর এগুলি পেতে হবে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। ফলে কৃষির প্রায় সকল উপকরণ থেকে কৃষকরা হবে বঞ্চিত। নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে উদ্যোক্তাদের দাক্ষিণ্যের উপর। আজ বিটি তুলা চাষ করে একের পর এক কৃষক সর্বশান্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

বক্তারা বলেন, জিএম ফুডের শারীরিক ক্ষতিকর প্রভাব বিলম্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী। আমেরিকার মত উন্নত দেশে তাই জিএম প্রযুক্তি পরিত্যাগ করা হচ্ছে। আর ভারত, বাংলাদেশ, আফ্রিকার মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা নতুন উদ্যোগে শুরু হচ্ছে।

বক্তারা বলেন, ভারতে রয়েছে নানা সম্পদের সহজ জোগান (রিসোর্স) এবং বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে বিরাট এক খাদ্য বাজারের সম্ভাবনা। "India is the 2nd largest potential market of the world." তাই প্রত্যেক ক্ষমতাশীল দেশই চায় ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সেখানে ভারত তো আমেরিকার টার্গেট হবেই।

এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? এই প্রসঙ্গে বলা হয় –

প্রথমতঃ বিদেশী খবরদারি থেকে দেশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে – সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে বাধ্য করাতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ জিএম চাষে ব্যবহৃত কৃষি-রাসায়নিকগুলি জৈব-সঞ্জাত নয়। অথচ জৈব সার, কীটনাশক জৈব-প্রযুক্তিতে (বায়ো টেকনোলজি) চাষে খুব কার্যকরী; এটা উৎপাদন বাড়ায়। অন্যদিকে কৃষি রাসায়নিকগুলি দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদন কমায়। তাই জিএম প্রযুক্তির পরিবর্তে জৈব-প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ সকল ধরনের নিরাপদমূলক পরীক্ষ-নিরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন কোন পরীক্ষাগার নেই।

চতুর্থতঃ বিটি কটন চাষ বন্ধ করে কৃষকদের আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চমতঃ ইতিমধ্যে জিএম চাষে যে ক্ষতি হয়েছে বা হতে পারে তার সমতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

অন্য বক্তা কৃষিকে আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচানোর উপায় বলতে গিয়ে বলেন, কৃষি ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল (ইকোনমিক্যালি ভায়াবেল) হতে হবে। কৃষকদের সরাসরি সহযোগিতা করতে হবে। যেমন আমেরিকাসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে করা হয়। তিনি বলেন প্রতিদিন সকাল সাড়ে নটায় পাঞ্জাবের ভাতিন্দা থেকে ছেড়ে বিকানিরের দিকে যায় যে ট্রেন, সেই ৩৩৯ নম্বর আপ ট্রেনটি বোঝাই থাকে ক্যান্সার আক্রান্ত কৃষকে। এঁরা বিকানিরের ক্যান্সার হাসপাতালে যান চিকিৎসার জন্য। সেই ট্রেনটিকে স্থানীয় মানুষেরা বলেন ক্যান্সার ট্রেন। কয়েক বছরের সবুজ বিপ্লবের এই হল অন্তিম পরিনাম।

উক্ত আলোচনায় সার্বিকভাবে ভারতে কৃষি সংকটের কারণ হিসাবে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার, রাসায়নিক বা অজৈব সার - কীটনাশকের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়েছে এবং দেশের প্রাচীন স্বাভাবিক, প্রযুক্তির প্রয়োগহীন কৃষি ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে জনমত গঠন করা হয়েছে। জিন প্রযুক্তির বিরোধিতা করে সারের ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগের পক্ষ অবলম্বন করা হয়েছে। এক কথায় ইকো ফ্রেন্ডলি কৃষি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশবাদী গ্রীণ লবি অনেকদিন এই প্রচার করছে। অসংখ্য এন জি ও এর স্বপক্ষে আওয়াজ তুলছে। জৈব প্রযুক্তি বিপণনে নেমেছে নানা একচেটিয়া বহুজাতিকরা। কিন্তু যাদের জন্য এত প্রচার, এত আন্দোলন, এত ক্রন্দন তাদের অভিমত কী? সাধারণ কৃষকের কাছে দেশী না বিদেশী? জৈব না অজৈব? এই নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাঁদের উভয় প্রযুক্তিই চড়া দামে ক্রয় করতে হয়। অনেক কৃষকের মতে জৈব প্রযুক্তিতে খরচ বেশী, ফলন কম। কৃষকেরা তাই কোনটায় ফলন বেশী তার বিচারেই তা ব্যবহার করছেন। আলোচকরা কৃষি সংকটকে শুধুমাত্র প্রযুক্তি ব্যবহারের সংকট হিসাবেই দেখছেন কৃষি ব্যবস্থার সংকটকে সামনে আনছেন না। অর্থাৎ আলোচনায় সংকটের উৎস নির্ধারণের উদ্দেশ্য ছিল না। জৈব প্রযুক্তির প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য।■

পরিবেশ দিবসের আহ্বান
বাণিজ্যের স্বার্থে নয়, জনস্বার্থে চালিত হোক পরিবেশ সুরক্ষার ভাবনা

[৫ই জুন, ২০১২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ যে প্রচারপত্র প্রকাশ করেছে তার সাথে সহমত হয়ে আমরা তা প্রকাশ করলাম– সম্পাদক মণ্ডলী, সমীক্ষণ]

সাথী,

প্রত্যেক বছরের মত আবার আজ ৫ই জুন, ২০১২ বিশ্বপরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। বিগত বছরগুলির মত এবারো বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশ দূষণের দায় নিজেদের কাঁধে নিয়ে জনগণকে অঙ্গীকার নিতে হচ্ছে দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরী করার। শিল্পদূষণ, বন ধ্বংসকরণ থেকে শুরু করে হাওড়া নদীর জল দূষণ–সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে আমার আপনার কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে। বস্তুতঃ সারা বছর পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা, প্রচার সত্ত্বেও পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলির নায়কেরা দামী দামী বৈঠক করেও কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারছেন না–শেষ পর্যন্ত দায়ী করা হচ্ছে আমজনতার 'কর্মফলকে'। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা 'জলবায়ুর পরিবর্তনের' প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী মত শোনা যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে 'ওজোন স্তরে' ফুটো হয়ে যাওয়ার গল্পও এখন শোনা যাচ্ছে না অথচ কোটি কোটি টাকার 'পরিবেশ বান্ধব' পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে গেছে পৃথিবীর প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানীর সঙ্গে সৌরশক্তি ও অচিরাচরিত জ্বালানী শক্তির সংঘাতেরও কোন সমাধান দেখা যাচ্ছে না। দু'পক্ষের প্রবক্তারাই বাজারে তাঁদের পক্ষের জ্বালানী ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষে জোর সওয়াল করছেন।

সাথী,

বিশাল এই পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশ সুরক্ষা থেকে আমাদের ছোট্ট শহর আগরতলার আবর্জনার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা–কোনটাই সুসংহত জনকল্যাণকামী পরিকল্পনা ছাড়া আমার – আপনার একক প্রচেষ্টায় রূপায়ণ সম্ভব নয়। বন ধ্বংস করা হবে কি বাঁচানো হবে, শিল্প-কারখানা দূষণ করবে কি করবে না, নদীর বা খালের ধারের বস্তি গুলির সুষ্ঠু পুনর্বাসন হবে কি হবে না, শহরে আবর্জনা জমে থাকবে নাকি ময়লাখোলা নরক কুণ্ডে পরিণত হবে–এই সমস্ত পরিকল্পনা ও রূপায়ণে সাধারণ মানুষের অংশীদারী কতটুকু আছে? বিজ্ঞানসম্মত পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে নির্মল ও রোগমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য বিভিন্ন গণসংগঠন তথা সাধারণ মানুষের আওয়াজ কতটুকু গ্রাহ্য হচ্ছে? সরকারী পরিকল্পনা তথা রূপায়ণ কি এই অভিমুখে সত্যি সত্যিই যাচ্ছে? কোন্ জনমত নিয়ে ত্রিপুরার নিজস্ব জৈব বৈচিত্র্য ধ্বংস করে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থকরী গাছের 'মনোকালচার' করে বনসৃজনের ঢাক পেটানো হচ্ছে? শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর 'বর্ষাবনের প্রায় ৭০ শতাংশ কেটে নিয়েছে কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা, তারপর আবার 'পরিবেশ সুরক্ষা'র নামে অর্থকরী গাছ লাগিয়ে ভবিষ্যতের ব্যবসা সুরক্ষিত করা হচ্ছে। শিল্প কারখানার নিয়ন্ত্রণ কি সাধারণ মানুষের হাতে? তাই লঘু-গুরু নানা স্তরের আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকে দূষণ ছড়ানোরও ব্যবস্থা আছে।

সাথী,

পৃথিবীর তথাকথিত 'উন্নয়নশীল' রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা তথা আমাদের প্রিয় শহর আগরতলাতেও আমরা দেখছি নগরায়ণের নামে এক ধারাবাহিক নরকগুলজার করা পরিস্থিতি। বছরের পর বছর ধরে চলছে নির্মাণ ও সংস্কার পর্ব। আর এই ভাঙ্গা-গড়ার ডামাডোলে রাস্তাঘাট, পার্শ্ববতী বাড়িঘর, নর্দমা সব একাকার হয়ে পুতিগন্ধময় এক ধুলিধূসর অবস্থা সষ্টি করেছে। এটাই কি বিজ্ঞানসম্মত নগরায়ন পরিকল্পনা? ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরার নদীগুলিতেও নাব্যতার ও বিজ্ঞানসম্মত নগরপরিকল্পনার অভাবে দূষণ বাড়ছে দিনের পর দিন।

বন্ধুগণ,

মুনাফার লক্ষ্যে জীবনের সমস্ত উপাদানকে পণ্য করে তোলা এই সমাজে, আমাদের আওয়াজ কি প্রশাসন ও সরকারের কানে পৌঁছায়? বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার

হাতে মুনাফা তুলে দেওয়াই কি 'পরিবেশ বান্ধব' অর্থনীতি? আমরা কোন্‌টা চাইব? মুনাফা দায়ী 'বনসৃজন' নাকি পরিবেশকে মানুষ তথা জীবজগতের বাসযোগ্য রাখার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। যে শাসকেরা পরিবেশ দূষণ নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে তারা প্রায় প্রতিদিন নিজেদের অবস্থানও পাল্টাচ্ছে–নতুন নতুন মুনাফার সম্ভাবনার নতুন নতুন বক্তব্য হাজির করছে। আমরা কি শুধুই বিভ্রান্ত হব? হিরোসিমা-নাগাসাকি থেকে ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের জন্য দায়ী কে? আমি-আপনি সাধারণ মানুষ? তবে বন্ধু, কেন শাসকের কণ্ঠস্বর আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে? বহুজাতিক কোম্পানীর উৎকণ্ঠা কেন আমাদের উদ্বেগের কারণ হবে? আমরা চাইব জনস্বার্থে পরিকল্পিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। নগর-নদী-বন সুরক্ষার প্রশ্নে, পরমাণু শক্তি ব্যবহারের প্রশ্নে মানুষের স্বার্থই শেষ কথা।

সুতরাং বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ সমস্ত সচেতন নাগরিকের কাছে আবেদন রাখছে পরিবেশ সুরক্ষার নামে কর্পোরেট স্বার্থ সুরক্ষার পরিবর্তে প্রকৃত জনকল্যাণকামী পরিবেশ পরিকল্পনার জন্য সরকারের ও প্রশাসনের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে যে সমস্ত বিজ্ঞান ও সামাজিক সংগঠন জনমত ও আন্দোলন সংগঠিত করছে তাদের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে জনশক্তিকে আরও সুসংহত করার জন্য যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের প্রয়াসে আপনিও সামিল হোন। ■

❖

বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য হোন।
বিজ্ঞান আন্দোলনকে
শক্তিশালী করুন।

❖

বিজ্ঞান মনস্ক'র জন্য একটি কবিতা

– অমরেন্দ্রনাথ বৈদ্য

বিজ্ঞান মনস্কতা, বিজ্ঞান মনস্কতা
মানবের দূর্জয় মুক্তিদাতা।
জাগ্রত জীবনের জিজ্ঞাসা–
সন্ধানী মানুষের আকুলতা,
রহস্য-রোমাঞ্চ প্রকাশ তা।

কার্য ও কারণের মধ্যে–
যুক্তির শৃঙ্খলা সৃষ্টি,
স্বুস্থ, সবল, সমৃদ্ধির-
দুর্বার গতিময় কৃষ্টি।

দূর করে যত প্রতিবন্ধককতা॥

মানুষের অতন্দ্র সাধনায়-
সভ্যতা হয় সমৃদ্ধ,
বিজ্ঞান চেতনার স্বপ্নে-
শত শত শতাব্দী ঋদ্ধ।

আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ-
বস্তুবাদী পথে চলবো।

বিজ্ঞান বিশ্বের পরম ত্রাতা॥

ঝাড়ফুঁক তুক্‌ তাক মন্ত্র-
তাবিজ, কবজ, আজ ভুলে যাও,
নিজের উপর রাখ আস্থা-
পাথর ধারণ করে কি যে পাও!

বাঁচবার একটাই রাস্তা-
বিশ্বের বিজ্ঞান রক্ষা,
যুগে যুগে জীবনের লুডোটায়-
পড়বেই তাহলে তো ছক্কা।

সকলের দাবী হোক এ মালা গাঁথা॥

বিজ্ঞানের খবর

এপ্রিল ২০১২

৪. 'নেচার' পত্রিকা প্রকাশ করল – অতীতের জলবায়ুর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা জানিয়েছেন যে শেষ বরফ-যুগটির অবসান ঘটেছিল পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে। এই বিশ্লেষণটিতে এও দেখানো হয়েছে যে সেই সময়ে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা-বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটু আগে হয়েছিল।

৫. ক) ডাচ এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা জানালেন যে তাঁরা হীরক'কে ব্যবহার করে একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন।

খ) আরও শক্তি-বৃদ্ধির পর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার'টি চালু করা হল। এখন এর টোটাল কলিশন এনার্জি (total collision energy) ৮ TeV যা এর আগের ৭ TeV-র তুলনায় অনেকটাই বেশী।

৮. মার্কিন বিজ্ঞানীরা জানালেন যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ-এর সাহায্যে তরল পদার্থকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য পদার্থটিকে স্বচ্ছ 'graphene sheet'-এর মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণ চালানো যেতে পারে। এই আবিষ্কার মাইক্রো এবং ন্যানো স্কেলে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১২. ক) ফ্রান্সের একদল বিজ্ঞানী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এখনও অবধি যতটা আবিষ্কার হয়েছে তার একটি 'কম্পিউটার মডেল সিমুলেশন' (computer model simulation) তৈরী করলেন। এতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশের একেবারে বিগ ব্যাং থেকে আজ অবধি বিকাশের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

খ) জার্মান বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রথম 'ইউনিভার্সাল কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক'-এর একটি নমুনা তৈরী করলেন। এই নমুনাটির সাহায্যে তারা ২১ মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি পরীক্ষাগারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৩. ক) ডাচ বিজ্ঞানীরা জানালেন যে তাঁরা 'ম্যাজোরানা ফার্মিয়ন'-এর (Majorana fermion) অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। এটি এমন একটি 'পার্টিক্‌ল' যে কিনা নিজেই নিজের 'অ্যান্টিপার্টিক্‌ল'। ১৯৩০-এর দশকে ইতালীয় বিজ্ঞানী এট্টোরে ম্যাজোরানা (Ettore Majorana)এই ধরণের কণার অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

খ) আমেরিকার ইউ সি এল এ-র গবেষকরা ঘোষণা করলেন যে তাঁরা স্টেম সেল-এর জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে ইঁদুরের মধ্যে এইচ আই ভি-কে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছেন।

১৫. ফরাসী গবেষকরা স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি বিশ্লেষণ করে জানালেন যে এশিয়ার কারাকোরাম পর্বতমালার কিছু হিমবাহের গত কয়েক বছরে ভর-বৃদ্ধি হয়েছে। এটা সারা পৃথিবী জুড়ে হিমবাহ গলনের যে প্রবণতা তার বিপরীত। এ প্রসঙ্গে জানানো যে এই তথ্যটি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় বার বার পর্যবেক্ষণ করেন এবং শেষে একই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন।

১৯. ব্রিটেন এবং কানাডার এক দল বিজ্ঞানী জানালেন যে 'ব্রেস্ট ক্যানসার' দশ রকমের হতে পারে এবং এই রোগের মাত্রা নির্ধারিত হয় কিছু জিনের দ্বারা। এই নতুন তথ্যের ফলে এই রোগের ডায়াগনোসিস আরও নিখুঁতভাবে করা যাবে।

২১. শিকাগোর নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি'র বিজ্ঞানীরা একটি 'ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেস'-এর সাহায্যে প্যারালাইজড রেসাস ('Rhesus') বাঁদরের মধ্যে পেশির সঞ্চালন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন। ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

২৬. গবেষকরা ৩০০টি অ্যাটম বিশিষ্ট একটি ক্রিস্টালাইন কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরী করলেন যার ক্ষমতা আজকের যে কোনও কম্পিউটার থেকে অনেক বেশি।

২৭. বিজ্ঞানীরা পায়রার মস্তিষ্কের ৫৩টি নিউরোনকে চিহ্নিত করলেন যা ব্যখ্যা করতে পারে কি করে এই পাখিটি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় করতে পারে।

মে ২০১২

১. ক) বিজ্ঞানীরা জানালেন যে একটি জেনেটিক টেস্ট-এর সাহায্যে কারোর ব্রেস্ট ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা রোগটিতে আক্রান্ত হওয়ার অনেক আগেই অনুমান করা যাবে। এর ফলে তার চিকিৎসার জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

খ) ফরাসী বিজ্ঞানীরা সিলিকন-এর এক অ্যাটম পুরু একটি স্তর তৈরী করতে সক্ষম হলেন। এর নাম 'সিলিসিন' (silicene)। এই ঘটনা ব্যাপক হারে ন্যানো স্কেল কম্পিউটার তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

৭. বৈজ্ঞানিকরা গাছের পাতার অনুরূপ একটি কৃত্রিম যন্ত্র তৈরী করলেন যা গাছের পাতার মতই ফোটোসিন্থেসিস-এর মাধ্যমে জল এবং সূর্যের আলো'কে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার যোগ্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে।

১১. চীনা বৈজ্ঞানিকরা কোয়ান্টাম টেলিপোরটেশন-কে (Quantum teleportation)-কে কাজে লাগিয়ে আলোর কণা অর্থাৎ ফোটনকে এক জায়গা থেকে ৯৭ কিমি দূরত্বে অবস্থিত আরেক জায়গায় পাঠাতে সফল হলেন এ ক্ষেত্রে এই দূরত্ব এখনও অবধি সর্বাধিক। তথ্য আদান-প্রদানে গোপনীয়তা নিশ্চিত করার পথে এটি একটি অগ্রগতি।

১৫. মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্র নির্মাণ করলেন যা জিনগত পরিবর্তন ঘটানো ভাইরাসকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করতে সক্ষম।

২৩. 'স্টেম সেল থেরাপি'র ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা – ইসরায়েলের বিজ্ঞানীরা রোগীদের স্কিন সেল থেকে হার্ট মাসল সেল তৈরী করায় সফল হলেন। হৃদরোগের চিকিৎসায় এই ঘটনা নুতন পথ দেখাতে পারে।

২৫. মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্র তৈরী করলেন যা আলো'কে ২৫০০০ মাইক্রোস্কোপিক লেন্স-এর মধ্যে আপাত-স্থির অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে।

৩০. ভূবিজ্ঞানীরা জানালেন যে অতীতে সুপার ভলক্যানোগুলি খুবই তাড়াতাড়ি বিকশিত হয়েছে। তৈরী হওয়ার কয়েকশো বছরের মধ্যেই তাদের থেকে লাভা উদ্গীরণ শুরু হয়েছিল। এর আগে মনে করা হত যে এগুলি হওয়ার পর লাভা উদ্গীরণ হতে প্রায় ২ লক্ষ বছর সময় লেগেছিল।

৩১. ক) 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি' (IUPAC) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল যে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে তৈরী ১১৪ এবং ১১৬ পরমাণু সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলির নাম হবে যথাক্রমে 'flerovium' এবং 'livermorium'।

খ) শার্প কর্পোরেশন এখনও অবধি সর্বাধিক 'সোলার এনার্জি কনভার্সন এফিসিয়েন্সি'র একটি সোলার সেল তৈরী করল। এর কনভার্সন এফিসিয়েন্সি ৪৩.৫%।

জুন ২০১২

১. নিউরোসায়েন্স-এর জগতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা – বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের মস্তিষ্কের একটি হুবহু চিত্র তৈরী করার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তার প্রথম ধাপের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন তারা। কোনও মেরুদন্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের হুবহু চিত্র গঠনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা।

৬. সুইডেনের কোরোলিনস্কা ইনস্টিটিউট অ্যালঝেইমার ডিজিজ-এর একটি নতুন ভ্যাকসিন প্রস্তুত করল।

৭. ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন-এর বিজ্ঞানীরা একটি ১৮ সপ্তাহের ভ্রূণের জিনগত গঠন নির্ণয় করতে সফল হলেন তার মায়ের রক্ত পরীক্ষা করে।

৮. জাপানের গবেষকরা স্টেম সেল থেকে একটি ছোট্ট কার্যকরী লিভার (যকৃৎ) তৈরী করতে সফল হলেন।

১৪. ক) চীনা বিজ্ঞানীরা জানালেন যে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জি এম) শষ্যের ক্ষেত আশপাশের নন জি এম শষ্যের ক্ষেতের জন্য ভাল। কারণ তা শষ্যের ক্ষতিকর কীটদের খায় এরকম পোকার বৃদ্ধি ঘটতে সাহায্য করে।

খ) গবেষকরা জানালেন যে স্পেন-এর গুহাচিত্রগুলি প্রায় ৩৮০০০ বছর আগে আঁকা। এটি এখনও অবধি ইউরোপের প্রাচীনতম শিল্প-কলার উদাহরণ। গবেষকদের মতে এই গুহা-চিত্রগুলি হয়তো হোমোসেপিয়ান নয়, নিয়েনডারথাল মানুষদের আঁকা।

১৫. মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা জানালেন যে ডায়াবেটিস এবং অ্যালঝেইমারস ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে একটি জিনগত সংযোগ থাকতে পারে।

২৭. ডাচ এবং জার্মান বিজ্ঞানীরা একটি 'ব্রেন স্ক্যানিং' যন্ত্র তৈরী করলেন যার সাহায্যে প্যারালাইজড রোগীরা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে টাইপ করে প্রকাশ করতে পারবেন। ■

চার্লি দ্য কিড ঃ একটি মানবতার দৃষ্টান্ত

[বিজ্ঞান মনস্কর বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১২তে চ্যাপলিনের 'দ্য কিড' চলচিত্রটি দেখানো হয়। দর্শকদের ছবিটির প্রতি সংবেদনশীল আবেদন পত্রিকাকে বাধ্য করেছে ছবিটির একটি মূল্যায়ন করার। –সম্পাদক]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবাজদের অর্থ ও হিংসার প্রকোপে সামাজিক মূল্যবোধ যখন কিনারায় এসে ঠেকেছে, ঠিক সেই সময়কে চার্লি চ্যাপলিন ধরলেন একটি সদ্যোজাত শিশুর জীবনের আধারে। ছবিটির নাম দিলেন 'দ্য কিড'। একটি শিশুই এই ছবির বিষয়। শিশু কি কখনো বিষয় হতে পারে! অন্ততঃ একটি প্রায় ঘন্টাখানেকের পূর্ণাঙ্গ চলচিত্রে! শিশু না বলতে পারে কথা, না বিনিময় করতে পারে ভাব। তাহলে চ্যাপলিনের মতো একজন পৃথিবী বিখ্যাত চিত্র পরিচালক এ ছবির বিষয় হিসাবে একটি শিশুকে রাখলেন কেন এনিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে। শিশু ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিপাট সারল্য। যে সারল্যকে দেখে অমানুষের মনেও মানবতাবোধ জন্ম নেয়। তাই 'মানবতাবোধ' যেখানে বিষয় সেখানে শিশুর মডেলের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে!

মজার বিষয় হ'ল এই যে, মানবতা যখন ছবির দর্শকের কাছে উপস্থাপিত, তখন সমাজের মধ্যবিত্ত ও ধনীদের হৃদয় অস্তাচলে গেছে। তাই শুরুর দৃশ্যেই পর্দায় ভেসে ওঠে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা – "The woman whose sin was motherhood." অর্থাৎ মাতৃত্বটাই যে সমাজে কলঙ্ক সেই সমাজের গল্প বলছেন চ্যাপলিন আমাদের। আর এই গভীর অর্থ বোঝানোর পাশাপাশিই তিনি মজা করছেন। করছেন হতভাগ্য শিশুটিকে এবং টমি চরিত্রটিকে নিয়ে। 'টম' নামটি মানুষের হলেও 'টমি' নাম সাধারণত পোষা কুকুরদেরকে দেওয়া হয়। ছবিটির 'টমি' নামক চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন চ্যাপলিন স্বয়ং। ছবিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন সম্পূর্ণ ছবিটির কোথাও কোনো কথা নেই, অর্থাৎ পুরোটাই নির্বাক ছবি। তবুও আবহসঙ্গীত ও অভিনয়ে ঘটনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে দর্শকদের কাছে। এই সামান্য উপাদানেই সমাজকে আধার করে মধ্যবিত্ত-ধনী ও সবহারা মানুষের মূল্যবোধদ্বয়কে যেন পাশাপাশি রেখেই মজা করছেন চ্যাপলিন। এই মজার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে একটি দর্শন যা তীব্রভাবে ধিক্কার জানাচ্ছে এই হৃদয়হীন ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। মজা করার কারণটিকে এভাবে দেখা যেতে পারে যে এর মাধ্যমে দর্শকদের অনুভূতিগুলোকে আরো সংবেদনশীল করে তোলা একটু একটু করে যাতে মুল কথার বীভৎসতা তাঁদের মনকে সরব করে তোলে। অথবা এভাবেও ভাবতে পারেন যে যাদের অমানবতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার এই ছবি, তাদেরকেও এক অর্থে মজায় সামিল করে নিয়ে অন্তিমপর্বে অস্বস্তিকর স্ববিরোধিতায় ফেলে দেওয়া। তাই চ্যাপলিনের ছবি দেখতে গেলে এই মজার তাৎপর্যটা উপলব্ধি করে নিতে হবে, তা না হলে তার পিছনে অন্তর্নিহিত সবহারানো গভীর দুঃখের জীবন থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্পিরিটটিকে চ্যাপলিন যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে বোঝা যাবে না।

ছবি শুরুর মুহূর্তেই আমরা দেখি একটি চ্যারিটি হসপিটাল থেকে সদ্যোজাত শিশু কোলে বেরিয়ে আসছেন এক মহিলা। দর্শকরা বুঝতে পারেন এই মহিলারই শিশু এটি, জন্মের পর তিনি শিশুটিকে নিয়ে হসপিটাল থেকে বেরোচ্ছেন। খচ্ করে মনে প্রশ্ন জাগে – 'সঙ্গে কেউ নেই কেন, শিশুটির বাবা কোথায়? প্রশ্নটির তক্ষুণি উত্তর পাওয়া যায় না, তবে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পর্দায় লেখা ফুট ওঠে 'A picture with a smile - and perhaps, a tear.' কিন্তু এমন আনন্দের মুহূর্তে চোখের জল

কেন? একি আনন্দের কান্না? না, আনন্দের কান্না এত নিঃসঙ্গ হবে কেন! দেখা যায় মহিলাটি পার্কে এসে একটু বিশ্রাম নেন। চিন্তায় শরীরের রক্ত চলে না। এই রক্ত দিয়েই গড়ে তোলা তাঁর সন্তান। যুদ্ধে ওর বাবা কোথায় হারিয়ে গেছে তারা জানে না। মহিলার নিজের কোনো উপার্জন নেই। দূরে দেখা যায় ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশু এগিয়ে যাচ্ছেন। এই ক্রুশের মতোই ভার সদ্যো মা হওয়া মহিলাটির বুকে। এই ভার নিয়ে কোথাও যাত্রা করা যাবে না। এই সময়ে কেউ কারুর কথা বোঝে না। পার্কে অপরদিকে ঝরনার জল ওঠে নামে – এটা যেমন ঠিক করতে পারে না যে তাকে কতটা উঠতে হবে বা কতটা নামতে হবে, তাকে নামানো হয়। তেমনি শিশুর মায়ের অবস্থাও অনেকটা এইরকম। নিজের বাঁচার তাগিদ তাঁকে এই ভাবনার দিকে নিয়ে যায় যে – শিশু তো তাঁর গর্ভে আবার আসতে পারে ...। এই মনে করে একটা থেমে থাকা বড়লোকী গাড়িতে তিনি তাঁর শিশুটিকে শেষ চুম্বন করে ফেলে রেখে চলে যান। সেই শিশু ক্রমে ক্রমে এসে জমা হয় আস্তাকুঁড়েতে। সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে। ঠিক এই সময়েই পরিত্যক্ত টমি ওরফে চ্যাপলিনের আবির্ভাব ঘটে পর্দায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরতেই কোনো একটি বাড়ির দোতলা থেকে তার মাথার ওপর রাতের ময়লা ফেলা হয়। আচমকা ময়লার ধাক্কায় তার হাতের বিড়িটিও খসে পড়ে হাত থেকে। আর একটু এগোতেই মাথায় আবার ময়লা ফেলা হয়। ভদ্র মধ্যবিত্তের এইসব করার অধিকার যেমন আছে তেমন তার মতো সব কিছু হারানো মানুষদের প্রতিবাদ করার অধিকারটুকুও নেই। এহেন পরিস্থিতিতে সে বাচ্চাটিকে দেখতে পায়। প্রথমে ভাবে কেউ তাকে ফেলে গেছে। তাই ভেবে সে তাকে তুলে নেয় কোলে। এমতাবস্থায় সে কাউকে খুঁজে না পেয়ে নিজেকে দায়িত্ব নিতে হবে মনে করে শিশুটিকে আবার ঐ আস্তাকুঁড়েতে ফেলে রেখে আসতেই পিছনে দেখে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়ে সে শিশুটিকে আবার কোলে তুলে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এভাবে শিশুটিকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে যখন সে তাকে কোনোভাবেই ছেড়ে পালাতে পারে না, তখন ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে তাকে কোলে নিয়ে খেলা শুরু করে। ঠিক এমন অবস্থাতেই নাড়াচাড়ায় একটি ছোট্ট কাগজের চিরকূট বেরিয়ে আসে যার মধ্যে লেখা আছে – "Please love and care for the orphan child". একমাত্র তখনই দেখা গেল টমি অতি স্নেহের সাথে তাকে বুকে টেনে নিল। সম্পূর্ণ ছবিতে এই দৃশ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় এইখান থেকেই যেন গল্প গতি পেল। আগের ঘটনাগুলো ছিল যেন তার পরিপ্রেক্ষিত।

ফিল্ম বা ছবির কতকগুলো বিষয় থাকে। ভালো ছবির গুণগত মান আমরা বিচার করব কিভাবে এনিয়ে কেউ বলেন ছবির বক্তব্যকে গভীর অর্থবহ হতে হবে, কেউ বলেন ভালো অভিনয়সমৃদ্ধ, ক্যামেরা ও অন্যান্য টেকনিক্যাল ব্যাপার সমৃদ্ধ হতে হবে আবার কেউ কেউ বলেন ভালো একটা গল্প থাকতে হবে যার বহুদিন রেশ থাকে। এগুলো তো গেল দর্শকদের দাবী। পরিচালক বা ফিল্মমেকার এসবের ঊর্ধ্বে। দর্শকদের ভালো ফিল্ম সম্বন্ধে ধারণা তৈরী হয় কোনো না কোনো ফিল্ম দেখেই যা কোনো না কোনো পরিচালকেরই তৈরী। তাই ফিল্ম পরিচালককে ফিল্ম বানানোর বিষয়গুলো ঢেলে সাজাতে হয়। প্রথম ব্যাপারটি হল, একটি গল্প বলতে হবে। কিভাবে বলবেন, কিছু চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত মূলক সংলাপ ও ঘটনার মাধ্যমে বলবেন। কিভাবে ঘটবে সেই ঘটনা বা কিভাবে বলা হবে সেই সংলাপ! সংলাপ লেখা যাবে তখনই যখন প্রতিটি চরিত্র কোন্ পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেয় তার সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যাবে। আর সেই নিয়মটি আবিষ্কার করতেই পরিচালককে যেতে হয় ফিল্মের সংলাপের নেপথ্যে তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে। একাজটির সবকিছু হয়তো ফিল্মের সংলাপে দেওয়া যায় না, কিন্তু কোন্ চরিত্র কোন্ পরিস্থিতিতে কিরকম আচরণ করতে পারে যাতে তা তার স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে হয় – এ জ্ঞান পরিচালকের না থাকলে চরিত্রগুলির চরিত্র হয়ে পড়ে অবাস্তব যা নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মূল বিষয়টিকেই হারিয়ে ফেলে। ফলে দর্শকের কাছে আলাদা করে দেখলে ছবিতে কোনো কিছু দুর্বোধ্য না ঠেকলেও ঘটনা ঘটবার প্রাসঙ্গিকতাকেই ভিত্তিহীন বলে মনে হয়।

চ্যাপলিনের 'দ্য কিড' ছবিটিতেও আগের ঘটনাগুলি ছিল মূলচরিত্রগুলির চরিত্রায়ন প্রসঙ্গে। টমিকে গোড়া থেকেই ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে একজন সবহারা কিন্তু লুম্পেন মানুষ হিসাবে। লুম্পেন কেন বলছি? সমাজ যে শিশুকে পরিত্যাগ করল, মাও সেই সংস্কৃতির আধারে যখন তাঁর নিজের সন্তানকে পরিত্যাগ করল, তখনই তো ছবিতে টমির আগমন। আগমনের শুরুতেই তথাকথিত ভদ্রসমাজের প্রতি তার তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার সূক্ষ্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে। সেই যুক্তিতে সেই তো অনাথ পরিত্যক্ত এই শিশুটিকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারত নিজের দলের মানুষ ভেবে। দিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তা একদম ফেলে রেখে পালানোর চেষ্টা করার পরেই কেবল,

তার আগে নয়। এখান থেকেই দর্শককে বুঝে নিতে হবে যে এই চরিত্রটি তাহলে ছবির রোল মডেল নয় যার মুভমেন্টই ছবির সরাসরি বক্তব্য হবে। এটা হল একটি দিক। আবার অন্যদিক থেকে ভেবে দেখুন, টমি যখন শিশুটিকে প্রথম পেল তখনও কিন্তু সে জানে না যে শিশুটি তার মতোই সমাজ দ্বারা পরিত্যক্ত। সে আন্দাজ করছিল ঠিকই। তাই শিশু হলেও সে বড়লোক বাড়ির কারো, এই ভেবেই হয়ত তার নিজের অধিকারবোধ খাটাতে সে সাহস বা ভরসা পাচ্ছিল না। কিন্তু যখন সে কাগজের চিরকূটের মাধ্যমে এবিষয়ে নিশ্চিত হল যে শিশুটির কেউ নেই, তখনই সে তার জীবনে প্রথম কোনো দায়িত্ব নিতে স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে এল। তাই ছবির এই সন্ধিক্ষণে একদিকে যেমন টমি শুধু একজন লুম্পেন থেকে উত্তীর্ণ হল দায়িত্বশীল পিতার মর্যাদায় ও ভূমিকায়, অন্যদিকে এই চরিত্রায়নের মাধ্যমে ফিল্ম মোড় নিল এক নতুন অধ্যায়ে যেখানে আমরা প্রথম অনুভব করলাম – কোনো ব্যক্তি নয়, এ ফিল্মের বিষয় একটি ভয়ঙ্কর সম্পর্ক। রক্তের সম্পর্ক নয়, মানুষের প্রয়োজনে মানুষের প্রতি মানুষের সম্পর্ক।

ধরা যাক ছবিটি যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত, তাহলেও কিন্তু দর্শক একই শিক্ষা পেতেন যে শিক্ষা তাঁরা সম্পূর্ণ ফিল্মটি দেখে পেয়েছেন। আমাদের কাছে তাই ফিল্মের বাকি অংশ একঅর্থে আলোচিত দৃশ্যটির তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে হয়ত বলবেন যে পরবর্তী ওতোপ্রোত মানবিক সম্পর্কে দৃশ্যগুলো কি সব অপ্রয়োজনীয়? সেগুলোর কি ততোধিক গুরুত্ব নেই! দর্শকের মন তো সবচেয়ে বেশী আর্দ্র হয়েছে পিতা ও সন্তানকে জোর করে বিচ্ছেদ করে দেবার দৃশ্যে।

আমরা বলব নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেগুলো অনেক সহজ ও সাময়িক। কিন্তু এই দৃশ্যগুলো ঘটবার পূর্বশর্তটিই ছিল মানবতার গুণগত উত্তরণ। এটি না হলে ভবিষ্যতের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হত। গুণগত উত্তরণের কারণে পরিচালকের ইচ্ছা অনুযায়ী আরো সংবেদনশীল মুহূর্ত থাকতেই পারত। তাই পরবর্তী দৃশ্যতে আবেগ থাকতে পারে তবে সেই আবেগ তৈরী হওয়ার মানবিক শিক্ষাটি কিন্তু রয়ে গেছে শুরুর দিকের এই দৃশ্যতেই।

সম্পূর্ণ বিরোধী মূল্যবোধ ধারণকারী সমাজের প্রায় প্রতিটি মানুষের মূল্যবোধ যখন রসাতলে গেছে তখন একজন সবহারা লুম্পেনের গুণগত চারিত্রিক পরিবর্তন করাটা আসলে গোটা সমাজের সাধারণ মানুষের গুণগত পরিবর্তনকেই সূচীত করে। বাস্তবে এই ধরনের পরিবর্তন মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটার মাধ্যমে আসে। সে ঘটনাগুলোকে দেখাতে গিয়েই পরিচালকের গল্প শেষ হয়ে যায়। তাই পরিবর্তনের পর কি হল তা আর দেখানোর সুযোগ থাকে না। 'দ্য কিড'-এ শিশুর ব্যবহারকে একটি মাধ্যম হিসাবে ভাবা যেতে পারে যে মাধ্যমের গুণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই অমানবতা-মানবতার দ্বন্দ্বে সংখ্যালঘু হয়েও মানবতাই চূড়ান্ত শিক্ষা হয়েই রয়ে গেল দর্শকের মনে। একজন ফিল্মমেকার হিসাবে চ্যাপলিনের আবিষ্কার এখানেই। তা না হলে তিপ্পান্ন মিনিট কেন তিপ্পান্ন ঘন্টায়ও এই বক্তব্য বলে শেষ করা যেত না।

ফিল্ম সমালোচনার বহুদিক থাকে। অভিনয়, আবহসঙ্গীত, সম্পাদনা সমস্ত কিছুই একটি ফিল্মের গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'দ্য কিড'-এর সমালোচনা ছোট আকারে চার পাঁচ পাতায় করা সম্ভবই নয়। এর ব্যপ্তিই তার কারণ। আমরা এখানে শুধুমাত্র ফিল্মের চালিকা দৃশ্যের গুণগত বিশ্লেষণই করলাম। দৃশ্য ধরে ধরে ব্যাখ্যা, শব্দ ও আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ, ক্যামেরা, সম্পাদনা এবং সর্বোপরী অভিনয় – এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদাভাবেই দীর্ঘ রচনা তৈরী করা যায়। পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী তা ভবিষ্যতে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতেই পারে। ■

বি.দ্র. ঃ *কারোর যদি ফিল্মটি দেখবার উৎসাহ জাগে, তিনি যদি 'দ্য কিড' ছবিটি সংগ্রহ করতে না পারেন, বিজ্ঞানমনস্কর সাথে যোগাযোগ করলে তাকে ছবিটি দেওয়া হবে।*

সংগঠন সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার তেউরহাটে মাটির ফাটল নিয়ে আতঙ্ক – একটি সমীক্ষা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত, নবগ্রাম অঞ্চলের তেউরহাট গ্রামে জুলাই মাসের প্রথম দিকে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। লক্ষ্মীকান্তপুরগামী সূর্যপুর স্টেশন থেকে দেড়-দুই কিমি দূরের এই গ্রামের কয়েকটি জমিতে ফাটল দেখা দেয়। এই ফাটলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। কেউ বলে ঈশ্বরের রোষে জমি তলিয়ে যাবে! কেউ বলে মাটির নীচে ভগবানের মূর্তি আছে তাকে উত্তোলন না করলে বিপদ হবে! কেউ বলে নীচে গুপ্তধন আছে! কেউ বলে ইংরাজ আমলের মহামূল্যবান পিলার আছে মাটির নীচে, বাজ পড়ে তা চুম্বক হয়ে মাটি ফাটিয়ে দিয়েছে, ইত্যাদি।

স্থানীয় জেলা প্রশাসন জানায় গরমে (বৃষ্টি না হওয়ায়) জল শুকিয়ে মাটি ফেটে গেছে। কিন্তু জল শুকিয়ে মাটির ফাটল (ছয় কোনা চাপরা হয়) থেকে ভিন্ন দেখতে ২০-৪০ মিটার লম্বা-লম্বা (এবং প্রায় ১০ ফুট গভীর) ফাটল জল শুকিয়ে হয় না এটা গ্রামবাসীরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেও গুজবে জড়িয়ে পড়েন।

২১শে জুলাই বিজ্ঞান মনস্ক'র একটি টীম এলাকা অনুসন্ধান করতে যায়। দেখা যায় মন্দির সংলগ্ন চাষের জমিটি গড়ে পাশের জমি থেকে ০.৩ মিটার বসে গেছে। লম্বা লম্বা ফাটলগুলি (২০-৪০ মি. দীর্ঘ) শাখা প্রশাখা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফাটলগুলির দুপাড়ের জমি একের তুলনায় অন্য (০.১-০.৫ মিটার) উঁচু-নীচু হয়ে আছে। ফাটলগুলি যেখানে মিশেছে সেখানে গর্ত তৈরী হয়েছে, যা কোথাও কোথাও ১০ ফুট গভীর এবং ১ ফুট ব্যাসার্ধের। মাটির স্তর পরীক্ষা করে দেখা যায় যে উপরের ভূত্বকের স্তরগুলি নিম্নপ্রকার ঃ

কাদা মাটি
পান্ডব পোড়া মাটি/পীট (সর্বনিম্ন মানের কয়লা)
কাদা এঁটেল মাটি
মিদি দানা মাটি বা সিল্ট
মিহিদানা বালি

পরীক্ষার জন্য মাটি নিয়ে আসা হয় এবং গ্রামবাসীদের বলা হয় যে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, গুজবে কান দেবেন না। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমরা এসে আপনাদের ঘটনার ব্যাখ্য দেব। যে কোনও ঘটনার পিছনে একটা কারণ আছে। এটা সাধারণ গরমে মাটি ফাটার ঘটনা যেমন নয় তেমনি তা কোনও অলৌকিক কারণেও হয়নি।

ভূতাত্ত্বিক এবং স্থাপত্য বিজ্ঞানের বন্ধুদের সাহায্যে মাটির পরীক্ষা, এলাকার টেকটনিক গঠন ইত্যাদি জানা বোঝার পর গত ৯ই সেপ্টেম্বর এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে এর বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করা হয়।

এই অঞ্চলটি সমভূমি অঞ্চল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ অঞ্চলের অংশ। সাধারণ বৈশিষ্ট অনুসারে এটি একটি বেসিন অঞ্চল, অর্থাৎ এখানকার ভূমি ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে পর্বত বা মালভূমির তুলনায়। ব-দ্বীপ অঞ্চলে এই জমির নেমে যাওয়া বা সাবসিডেন্সের হার নির্ভর করে নীচস্থ ভূত্বকের গঠন ও আলোড়ন প্রণালী (টেকটনিক্সের) উপর। ভূতাত্ত্বিকরা জানেন যে এখানে ছোট ছোট লিস্ট্রিক ফল্ট (বক্রতল বিশিষ্ট চ্যুতি) দেখা যায়। একবার চ্যুতি ঘটার পর পলির আস্তরণ পড়ে উপরের ফাটল অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু মাটির অনেক নীচে এই ফাটলতলগুলি বজায় থাকে। প্লেট মুভমেন্ট বা ভূ আলোড়নের ফলে এবং বর্ষার আগে এবং ভারী বর্ষার পর চ্যুতিতলের সক্রিয়তা বেড়ে যেতে পারে। এই চ্যুতি তলগুলি স্বল্প গভীরতার, কিন্তু স্বল্প আকৃতির (আকার) হওয়ায় চ্যুতিগুলির প্রভাব অল্প এবং আঞ্চলিক স্তরের। চ্যুতিগুলি শাখা প্রশাখায় যেখানে বিভাজিত হচ্ছে সেখানে স্ট্রেসের মান সর্বাধিক হওয়ায় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়।

মাটি পরীক্ষা করে জানা যায় যে এর জলধারণ ক্ষমতা, চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অঞ্চলের অন্যান্য মাটির মতই স্বাভাবিক। এখানকার মাটিতে কোনও প্রকার অস্বাভাবিকতা নাই।

গ্রামবাসীদের ছবি এঁকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে ঘটনাটি বোঝানোর পর বলা হয় এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। কোনও অলৌকিক ঘটনা এটা নয়। মাঠে ফসল থাকলে আপনারা ফাটলগুলি হয়ত দেখতেও পেতেন না। যেমন এখন ওই জমিতে চাষ হওয়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাদের বলা হয় মাটির তলায় বৃহৎ কোনও গুপ্তধন, খনিজ সম্পদ বা চুম্বক কিছু নাই। এই ঘটনা মাঝে মধ্যেই হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে – এলাকা তলিয়ে যাবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। গ্রামবাসীরাই জানায় যে শুধু এই জমিতে নয়, আশপাশ এলাকায় অনেক জায়গায় এমন খবর আছে। বয়স্ক মানুষরা বলেন পূর্বপুরুষের কাছে অতীতেও এমন ঘটনার কথা তারা শুনেছেন। গ্রামীণ যুবকরা তখন বিভিন্ন কুসংস্কারের ব্যাখ্যা চান এবং বাজ পড়ার হাত থেকে বাঁচার উপায় কী জানতে চান। তাঁদের বলা হয় নিজেদের বাড়িতে বা মন্দিরে আর্থিং করা যেতে পারে। তবে চাষের জমিতে (যেখানে বাজে মৃত্যু বেশী হয়) সরকারী খরচে বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা করার দাবী করা উচিৎ।■

দ্বিতীয় বর্ষ❖সংখ্যা - ৩❖সেপ্টেম্বর ২০১২

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

সংগঠন সংবাদ

শিলিগুড়িতে 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' নিয়ে সেমিনার

গত ২০শে মে, ২০১২ শিলিগুড়ির তথ্যকেন্দ্রে রামকিঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত সেমিনার "বিশ্ব উষ্ণায়ন।" এককভাবে শিলিগুড়ির বুকে এটিই বিজ্ঞান মনস্কের প্রথম অনুষ্ঠান। এর আগে অবশ্য নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান মনস্ক'র ভূমিকম্পের উপর সেমিনার। বিজ্ঞান মনস্ক, নর্থবেঙ্গল শাখার সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুষ্ঠানটি সফল করেছেন। কলকাতা থেকে আগত সংগঠনের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

মে মাসের প্রচন্ড গরমে অনুষ্ঠান শুরু হতে কিছুটা দেরী হয়েছে। প্রায় ৭৫/৮০ জন দর্শক শ্রোতা বন্ধু উপস্থিত হয়েছিলেন। শিলিগুড়ির জনপ্রিয় শিল্পী গৌতম চক্রবর্তী স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। জয়া বিশ্বাস, বিজ্ঞান মনস্কের সদস্যা সংগঠনের পরিচয়/উদ্দেশ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণের উপর বক্তব্য রাখেন কাজল রায়, সংগঠনের সদস্য। এরপর শুরু হয় লৌকিক-অলৌকিক বিষয়ের উপর বিজ্ঞানের খেলা – অংশ নিয়েছেন কলকাতা থেকে আগত সদস্যরা। বিজ্ঞান কে কাজে লাগিয়ে মানুষের চোখে, ধুলো দিয়ে/ঠকিয়ে অসাধু উপায়ে যারা অর্থ উপার্জন করে – তারা সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক সেটা বোঝাবার জন্যই এই প্রদর্শনীর আয়োজন/অবতারণা। এরপর রণজিৎ মুখার্জীর সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনের পর শুরু হয় সেমিনার বিশ্ব উষ্ণায়ন। ভিডিও ক্লিপসের মাধ্যমে বিষয়টির উপর গবেষণালব্ধ বক্তব্য রাখেন কোলকাতা শাখার ৩ জন সদস্য। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত থেকে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর – যথাযথভাবে যুক্তিসহকারে রাখেন বক্তারা। অন্যান্যদের মধ্যে থেকেও বিভিন্ন ইতিবাচক প্রশ্ন করা হয়। কেউ কেউ বক্তব্যও রাখেন। বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি সদর হাসপাতালের ডাক্তার শ্রী বিপুল বিশ্বাস, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নর্থ বেঙ্গল ও সিকিম রিজিওনের আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক শ্রী গোপীনাথ রাহা এদিন আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন, শ্রী গোপাল ব্রহ্ম। সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং আগামী দিনে বিজ্ঞান মনস্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আশা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ■

পূর্ব বড়িষা অঞ্চলে জন্ডিস নিয়ে সেমিনার

বেহালা পূর্ব বড়িষার খালপাড় অঞ্চলে ঘরে ঘরে জন্ডিস সংক্রমণ নিয়ে সমীক্ষার পর মানুষের চাহিদা অনুসারে ১৭ই জুন একটি ঘরোয়া আলোচনা সভা করা হয়। সভায় সংগঠনের বক্তারা জন্ডিসের মতো রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাকে সামাজিকভাবে মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বক্তব্যের শেষে জন্ডিস সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়।

গত ১২ই অগাস্ট হার্ড মেটালের কাছে ঈশান ঘোষ রোডের জাগরণী ক্লাবে একই বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আগের অনুষ্ঠানের ন্যায় জন্ডিস কি ও কেন এবং এর প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক আগের আলোচনার মতই মনোগ্রাহী রূপে পরিবেশন করা হয়। বক্তব্যের শেষে শ্রোতাদের তরফ থেকে প্রশ্ন আসে যে কিভাবে সার্বিকভাবে দূষিত জল সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব। উত্তরে বলা হয় জল যারা সরবরাহ করে (অর্থাৎ এক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশন) তারাই এর সমাধান করতে পারে। স্থানীয় পৌরমাতাকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার দাবীতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র জমা দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে মানুষ সমবেত হলে বিজ্ঞান মনস্ক সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে থাকবে। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com